গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

ভারতের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই, ১৫ই অগাস্ট দিনটি পালিত হল। বাংলাদেশীরা দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসাবে উদযাপন করলেন, কারণ ওটা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী। আবার ঐ দিনটিই ছিল ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন। কাজেই বাঙ্গালির কাছে ১৫ই অগাস্ট একটি অবিস্মরণীয় এবং শিক্ষনীয় দিন। ঐ দিনটিকে স্মরণে রেখে আমরা কি ভূ-রাজনীতি এবং ধর্মীয় দালালদের কাছে মাথা হেঁট না করে এগিয়ে যেতে পারিনা?

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৩
অগাস্ট ২০২০

কলম হাতে

দীপঙ্কর সরকার, পত্রালিকা বিশ্বাস, অমিত কুমার সাহা, নাহার আলম, ডাঃ অমিত চৌধুরী, শামসুদ্দিন শিশির, জালাল উদ্দিন লস্কর শাহীন, সামিমা খাতুন, সিদ্ধার্থ বসু, এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

যুগ যুগ ধরে সকল সাহিত্যিকদের বহু মূল্যবান সৃষ্টিকর্মে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার সাহিত্যজগৎ। কিন্তু সেই সকল সাহিত্যিকদের চিরবিদায় সদাই পাঠককুলের চিত্তকে ব্যথিত করে নিয়ত। সম্প্রতি তেমনই একজন বিশিষ্ট প্রথিতযশা সাহিত্যিক, শ্রী নিমাই ভট্টাচার্যের মহাপ্রয়াণ বাংলার সাহিত্য জগতকে এক বিশাল শোকছায়ায় আবৃত করেছে।

তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩১ সালে নিমাইবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে সাংবাদিকতার কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বছর সাংবাদিকতা করার সুবাদে, তিনি বহু কাছ থেকে রাজনৈতিক মহল ও অন্যান্য আতিশয্যপূর্ণ দুনিয়াকে দেখেছেন। তাই তাঁর লেখার মধ্যেও সেইসব অভিজ্ঞতার চিত্রসকল বাস্তবতার অক্ষরে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘রাজধানীর নেপথ্যে’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। পরবর্তীকালে লেখালেখিকেই তিনি পেশা হিসাবে গ্রহন করেন। তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ১৫০ এরও অধিক, যার মধ্যে ‘মেমসাহেব’, ‘এডিস’, ‘রাজধানী এক্সপ্রেস’ ইত্যাদি পাঠক মহলে সুপঠিত এবং সুপ্রশংশিত। উপন্যাস ও ছোটগল্পের পাশাপাশি ‘বিপ্লবী বিবেকানন্দ’র মতো বইও তিনি লিখেছেন। সাতের দশকের গোড়ার দিকে তাঁর ‘মেমসাহেব’ উপন্যাসটি বাংলা সিনেমা জগতে রোম্যান্টিকতার মাইলফলক হিসাবে স্মরনীয়। ‘বাংলার জনপ্রিয়’ লেখক হিসাবে নিমাইবাবু পাঠকদের মনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ■

বিনীতা –

রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

URL: https://www.boichoi.com/RohosyerCharOdhyay

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

কলম হাতে

প্রচ্ছদ চিত্রঃ
গৌতম বোস

আমরা পাঠকগণের মতামত জানতে আগ্রহী। ই-মেলঃ
contactpandulipi@gmail.com

শুভ জন্মাষ্টমী

লিপিকা দত্ত সরকার

আজকের তিথিতে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান – বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় কংসের কারাগারে। আমরা এই পবিত্র তিথিকে হিন্দু শাস্ত্র মতে প্রতিটি বছর পালন করি জন্মাষ্টমী হিসেবে।

শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম।

জগতে প্রতিদিন অসংখ্য দেবশিশু জন্ম গ্রহণ করে চলেছে। এই পৃথিবী তাদের কাছে কংসের কারাগার না কি যশোদা ও নন্দবাবার গোকুল হবে, তা কিছুটা হলেও তাদের কৃতকর্ম তৈরি করে।

এই জগৎ সংসার একজন মানুষকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য সম্মান-শ্রদ্ধা বা অসম্মান-অশ্রদ্ধা করে চিরকাল। আমরা সব কিছুতেই ভাগ্যের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু ভাগ্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষ নয়। ভাগ্য তৈরি হয় প্রারব্ধ ও পুরুষাকারের উপর নির্ভর করে। তাই কি ভাবে এই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাব, তা অর্ধেকটা আমরা নিজেরা অবশ্যই তৈরি করি, বাকি অর্ধেক প্রারব্ধের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিদিন যে দেবশিশুরা জন্ম গ্রহণ করছে এই জগৎ সংসারে, তাদের কথা আমরা কতটুকু ভাবি নিজের মনে করে?

প্রার্থনা

সব সময় তো নিজের নিয়েই ব্যস্ত। সব সময় ভাবনা... "আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" দেবতা মন্দির- মসজিদ- গির্জাতে নয় – তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে আছেন সত্য স্বরূপ রূপে।

তাই প্রতিটি প্রাণকে সম্মান করা ও এই পৃথিবীকে সকলের বাস যোগ্য করাই প্রকৃত পূজা-সাধনা-তপস্যা-উপাসনা-আরাধনা।

প্রত্যেকের কাছেই নিজের নিজের সন্তান দেবশিশু... তা মানুষ বা জীবজন্তু বা পশু পাখি যাই হোক না কেন। প্রত্যেকের জীবনে উপযুক্ত আহার, সুস্থ দেহ, নিরাপদ আশ্রয় অবশ্যই প্রয়োজন। তারপর অবশ্যই প্রয়োজন শান্তির এক ভবিষ্যৎ।

জীবের ভিতরেই শিব বিরাজমান। জীবকে অস্বীকার করলে, বাকি সব কিছু মূল্যহীন। এসো বন্ধুরা, সেই বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রাণকে - প্রতিটি দেবশিশুকে আমাদের অন্তরের পবিত্র ভালোবাসা জানাই, জানাই শ্রদ্ধা। এই জগৎকে নিজের নিজের সাধ্য মতো নিজের শুভ চিন্তা ও পবিত্র কর্মের মধ্যে দিয়ে সকলের বাস যোগ্য গোকুল তৈরি করি এসো – যেখানে থাকবে অমৃত স্নেহের সুধা ও অপার শান্তি। তবেই প্রতিটি শুভ অনুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে পালন করা সার্থক হবে। একা স্বর্গীয় সুখও ভোগ করা যায় না কখনও।

শুভ জন্মাষ্ঠমী। সর্বশক্তিমান জগতের সকলের মঙ্গল করুন এই প্রার্থনা করছি হৃদয়ের গভীর থেকে আজ পবিত্র দিনে ।

শান্তির সাথে সুস্থ থেকো বন্ধু। ■

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

দ্বিতীয় পর্যায় (২)

সকাল থেকে প্রায় ষোলো কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেছে, খুব যে কষ্ট হচ্ছে তা নয়, তবে একটু বসতে পারলে ভাল হত। আমরা যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, গ্রামটির নাম কারিপুন। রাস্তার পাশের একটি বাড়ির থেকে একজন মধ্যবয়সি লোক সবিনয়ে আমাদের চা খাওয়ার জন্য ডাকল। ওরা কবির সম্প্রদায়ের লোক, যে কোন কারনেই হোক গ্রামে ওরা একঘরে। কেন তা জানতে চাইনি। অনেকক্ষণ অনেক ধরনের গল্প হল, কবিরজীর কথা আলোচনা হল, এবার ওঠার পালা। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে চলার ছন্দ ফিরে পেতে সময় লাগে, আমাদেরও তাই হল।

ওই মধ্যবয়সি লোকটি আমাদের কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেল। একটি স্কুল বাড়ির পেছন থেকে আমরা খাদের দিকে নামতে শুরু করলাম। ছোট পাথরের জন্য পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। তাহলে আর দেহ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। খুব সাবধানে নামছি, নামার পরেই আবার ওঠা, এই ভাবে দু'টি পাহাড় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে পেড়িয়ে এলাম একটি সালেপানি গ্রামে। চলার শক্তি শেষ, বোতলে খাবার জল ও নেই। প্রাণান্তকর অবস্থা, আরও দুই কিলোমিটার যাওয়ার

পরে আপাত সমতল একটি জায়গায় এলাম। একটি স্কুলে বাচ্চাদের ক্লাস হচ্ছে। দুজন শিক্ষক বাইরে বসে ছিলেন। টিউবওয়েল আছে দেখে জলের জন্য এগিয়ে গেলাম, ওঁরা আমাদের সাদরে বসার জায়গা দিলেন। হাত মুখ ধুয়ে, জল খেয়ে যখন আমরা ওঠবার কথা ভাবছি, তখন ওই শিক্ষকরা আমাদের মিড-ডে মিল খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। আমাদের সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু দিব্যানন্দজী রাজী হয়ে গেলেন এবং আমাদেরও খেয়ে নিতে বললেন। তখন দুপুর আড়াইটে। অনন্যপায় হয়ে রাজী হলাম।

মিড-ডে মিল খেয়ে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। তারপর গোরক্ষপুর নামের একটি শহরে এলাম। আগেও একটি গোরক্ষপুর পেয়ে ছিলাম। আসলে গোরক্ষনাথ যে যে জায়গায় তপস্যা করেছেন, সেই জায়গাগুলো সবই তাঁর নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রায় সন্ধে সাড়ে ছটার সময় একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম, কিন্তু গৃহস্বামী কিছুতেই আমাদের থাকতে দিতে রাজি নয়। অনেক অনুরোধের পর বারান্দায় থাকার অনুমতি দিলেন। সন্ধ্যের পরে এখানে ঠাণ্ডা পড়েছে। নিরুপায় হয়ে ঐখানেই আসন পাতলাম। এক বালতি জল দিয়ে আর পাওয়া যাবে না শুনিয়ে দিয়ে গেল, এই ব্যবহার পরিক্রমার পথে এই প্রথম পেলাম। প্রায় সাড়ে সাতটার পরে একটি ২০/২২ বছরের মেয়ে এসে আমরা রাত্রে খাব কিনা জানতে চাইল। দিব্যানন্দজী আর কাকাজী রাজি

হলেও আমি খাব না জানিয়ে দিলাম। প্রায় ন'টার সময় মেয়েটি আবার এসে ওদের খাবার দিয়ে গেল, এবং আমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করতে থাকল অন্তত কিছু খাওয়ার জন্য। মেয়েটির নিষ্পাপ ব্যবহারে ওর বাবার ব্যবহার ভুলে খেতে রাজি হলাম। আমার জন্য দুধ আর মিষ্টি এনে বসে থেকে খাইয়ে গেল। শুনলাম মেয়েটি বি-টেক পড়ছে।

আজ বৃহস্পতিবার ২৫/২/১৬ ভোর পাঁচটায় চলা শুরু করেছি, সূর্য তখনো ওঠেনি, তাই টর্চের আলো জ্বেলে গম খেতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ফলন খুব ভালই হয়েছে। শুধু কাটার অপেক্ষায়। হঠাৎ পেছন থেকে একজন চিৎকার করে বলইয়, 'মহারাজ রুকিয়ে।' বলল এটা পরিক্রমার রাস্তা নয়, ঠিক রাস্তা দেখানোর পর বুঝতে পারলাম প্রায় আধ কিলোমিটার ভুল পথে এসে গেছি। যাই হোক আবার সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে চলতে শুরু করলাম।

এখানে দেখছি বাতাসে আদ্রতা খুবই কম। সূর্য ভাল করে ওঠেনি, তাতেই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। জলের টান ধরছে, কাছাকাছি কোন দোকান দেখতে পাইনি। সকাল সাড়ে সাতটাও এদের কাছে ভোর। পথে একটি জৈন সাধুর দর্শন পেলাম। একটি চায়ের দোকান খুলেছে আমরা চা খাচ্ছি, এমন সময় আরও এগারো জন পরিক্রমাকারী ওখানে এসে বিশ্রামের জন্য দাঁড়ালো। দিব্যানন্দজীর ইচ্ছে মত আমরা ওদের ও চা খাইয়ে আর অপেক্ষা না করে

এগিয়ে চললাম। প্রায় আঠারো কিলোমিটার হেঁটে বর্গি ড্যামে এলাম, তখন প্রায় বেলা বারোটা।

এই দিকটায় প্রচণ্ড আদ্রতা, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। সাথে সূর্যের তেজে শরীর ঝলসে যাচ্ছে, আর হাঁটা যাচ্ছে না কিন্তু বসাও যাচ্ছে না। রাস্তার কাজ হচ্ছে তাই খুব নোংরা পরিবেশ। আরও তিন কিলোমিটার গেলে আমরা আশ্রয় পাবো শুনে আশ্বস্ত হলাম। এবারে কিছুটা চড়াই রাস্তা, এসে পৌঁছালাম একটি গণেশ মন্দিরে। মহারাজ সত্যানন্দজী আমাদের অবস্থা দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি বিশ্রামের জন্য ঘর খুলে দিলেন। কাকাজী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর জন্য ওষুধ দিলেন। দুটোর সময় ভোজন প্রসাদ পেলাম। তারপর পাঁচটা পর্যন্ত ঘুম। আরও কয়েকজন পরিক্রমাকারী এখানে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন মাতাজী বারবার আমাকে আজকে এখানে থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আমাদের অবস্থা দেখে মাতৃহৃদয়ে স্নেহ উথলে উঠেছে। যদিও আমাদের যাওয়ার ক্ষমতা নেই কিন্তু ওনাদের স্নেহশীল ব্যবহার মনকে নাড়া দিয়ে গেল। ওঁরা চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেলেন মাতৃহৃদয়ের কোমল স্পর্শ।

এখানে আপাত পাগল আরেকটি পরিক্রমাকারীর সাথে আলাপ হল, নাম গিরিধারি মহারাজ। নর্মদা মা কন্যা রূপে ওনার কাছে রুটি খেয়ে গেছেন। রাত্রে আটটার মধ্যে শুয়ে পড়েছি। মহারাজ কম্বল দিয়েছেন তাই অন্যদিনগুলোর

তুলনায় একটু আরামেই ঘুম হবে। রাত কত হবে জানি না, চমকে উঠলাম গিরিধারি মহারাজের ধাক্কা। উনি আমাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলেন এবং এমন কিছু পরামর্শ দিলেন যা আমার সারা জীবনের পাথেয়। পরিক্রমার পথে এই সমস্ত সাধু মহারাজদের সংস্পর্শ সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে। কখন ভোর হয়ে গেছে জানিনা। প্রাত্যহিক কাজের জন্য কাকাজী ও দিব্যানন্দজী উঠে এসেছেন। তাই মহারাজ প্রসঙ্গ পালটে আমাদের খুশি মনে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

রাত্রে মন্ত্রমুগ্ধের মত গিরিধারি মহারাজের সাথে বাইরে এসে যে সম্পদ আমি পেলাম তা সত্যই অমূল্য। মহারাজ বললেন, “বেটা তোমাকে যা বললাম কিসি কো মাত বোলনা। এতে তোমার প্রারব্ধ ক্ষয় হবে এবং কর্মনাশ হবে।” আমি বলে উঠলাম, “না মহারাজ কাউকে কিছু বলব না।” কাকাজী পাশ থেকে বলে উঠলেন, “কি বলবেন না ডাক্তারবাবু?” বাস্তবে ফিরে এলাম, কাল রাত্রের ঘটনা ভাবতে ভাবতে অনেকটা পথ চলে এসেছি।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

মুল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

অ্যামাজন লিঙ্কঃ

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

এখন কলেজ স্ট্রীটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ আদি নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩ ● দূরভাষঃ +৯১ ৩৩ ২২৪১ ৯১৮৩

স্বাধীন দুজনে

পত্রালিকা বিশ্বাস

সকালে রান্নাঘরে মাংসটা কষাতে কষাতেই রাহির দিকে চোখ চলে যায় মৃন্ময়ী দেবীর, আর মনে মনে ভাবেন, কদিন ধরেই মেয়েটার মুখটা থমথমে হয়ে আছে, কে জানে কি হলো, এরকম চুপচাপ তো থাকেনা। বরং ওর একের পর এক গল্পে রান্নাঘরেই বেশ একটা জমজমাট আসর বসে যায় রোজ। দিন তিনেক ধরেই খেয়াল করছেন মৃন্ময়ী দেবী, রাতেও ওদের ঘর থেকে বেশ জোরেই কথা কাটাকাটির আওয়াজ ভেসে আসে, তবে পাখার শব্দের সাথে মিশে গিয়ে কথাগুলো ঠিক পরিষ্কার বোঝা যায়না। আজও রাহিকে একইরকম থম মেরে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, “কিরে রাহি কদিন ধরেই দেখছি তুই খুব চুপচাপ? কিছু হয়েছে তোর? শরীর টরীর খারাপ না তো?”

রাহি – কই না তো মা। কিছু হয়নি তো।

মৃন্ময়ী দেবী – তুই তো এমন চুপচাপ থাকিস না। কি হয়েছে বল আমায়...

রাহি – কিচ্ছু হয়নি মা। তুমি মিছিমিছি চিন্তা করছো।

মৃন্ময়ী দেবী – আচ্ছা বুঝলাম তোর কিচ্ছু হয়নি।

এইতো চাই

কয়েকদিন ধরেই দেখছি রাতে নিলয় বেশ জোরে জোরে কথা বলে, তোদের মধ্যে কি কোন ঝগড়া হয়েছে নাকি রে?

রাহি – না না মা ঝগড়া না, ওই তোমার ছেলে একটা অফিসের ফাইল খুঁজে পাচ্ছিলনা, আমিই গুছিয়ে রেখে ভুলে গেছিলাম কোথায় রেখেছি। সেটা নিয়েই তোমার ছেলে একটু রেগে গেছিলো আর কি।

মৃন্ময়ী দেবী – তারপর পেয়েছিস সেই ফাইল?

রাহি – হ্যাঁ কালই তো আলমারি গোছাতে গিয়ে পেলাম। আচ্ছা মা আমি একটু ওপরে গেলাম, জামাকাপড় পড়ে আছে অনেক, ভাঁজ করে আলমারিতে তুলতে হবে।

মৃন্ময়ী দেবী যেন রাহির মুখ থেকে পাওয়া উত্তরগুলো শুনেও খুব একটা স্বস্তি পেলেন না, তাঁর কেন জানিনা মনে হচ্ছে রাহি সত্যি কথাটা চেপে গেলো। সকাল গেলে, দুপুরে রোজই একটু গড়িয়ে নেন মৃন্ময়ী দেবী, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে কি মনে করে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা উঠতেই নজরে পড়ে রাহি একটা গোলাপের টবের পাশটায় বসে কি যেন ভাবছে আর গুনগুন করে গেয়ে যাচ্ছে, "এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায় আমি যে গান গেয়েছিলেম/ জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥"

গানটা শেষ হতে হতেই দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে রাহির। সিঁড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবটাই দেখলেন মৃন্ময়ী দেবী, আর তারপর আস্তে আস্তে রাহির

পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাহি তখনও আপনমনে তাকিয়ে আছে ফুলগাছটার দিকে। মৃন্ময়ী দেবী রাহির কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, “কি হয়েছে আমায় বলবিনা?”

রাহি চমকে উঠে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে ঘুরে তাকিয়ে বলল, “কই মা কিচ্ছু হয়নি তো। ওই মাঝেমাঝে দক্ষিণের ফুরফুরে হাওয়া চোখে এসে লাগছে তো...”

মৃন্ময়ী দেবী – আর কত আড়াল করবি আমায় রাহি? আমি তোর নিজের মা হলে কি লুকিয়ে রাখতিস কথা এমন করে?

রাহি এবার নিজেকে আর সামলাতে পারেনা, মৃন্ময়ী দেবীর হাতটা ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মৃন্ময়ী দেবী তখনও ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, “বল রাহি। কি হয়েছে তোর?”

রাহি – আমার কলেজের রিইউনিয়নে আমায় গান করার জন্য ইনভিটেশন দিয়েছে মা।

মৃন্ময়ী দেবী – বাহ্। এতো খুব ভালো খবর। কবে তোদের রিইউনিয়ন? কিন্তু, তার জন্য তো তোর মনখারাপ হওয়ার কথা নয়।

রাহি – এইতো সেপ্টেম্বরের দশ তারিখে... মা, নিলয় একদম চাইছেনা যে আমি গান করি কলেজে।

মৃন্ময়ী দেবী – কেন? কি অসুবিধা? নিজের কলেজের অনুষ্ঠানে গান করবি, এতে নিলয়ের আপত্তির কোন কারন তো আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। আর রাহি তোকে তো এখন আর

গান করতেও দেখিনা। বিয়ের পর পর কয়েক মাস রেওয়াজ করতে দেখতাম, এখন তো আর দেখিনা!

রাহি – মা, তোমার ছেলে চায়না আমি আর গানটা কন্টিনিউ করি। তাই আর বসিনা রেওয়াজে।

মৃন্ময়ী দেবী – পুজোর ফাংশনে তোর গান শুনেই তো তোকে পছন্দ করেছিলো নিলয়। এখন না চাওয়ার কি হলো? আর তুই ওর কথা শুনে গানটা বন্ধ করে দিলি? তোর অত সুন্দর গানের গলা! সবার এমন প্রতিভা থাকেনা রাহি। এমন হেলায় হারিয়ে ফেলিস না তোর স্বপ্ন... আচ্ছা দাঁড়া আমি কথা বলবো নিলয়ের সাথে।

রাহি – মা, তুমি কিচ্ছু বলবেনা। তাহলে আবার অশান্তি হবে। আমার আর এত অশান্তি ভালো লাগেনা। নিলয় আমায় পরিষ্কার বলেছে মা, এসব ফাংশান টাংশান এই বাড়িতে থেকে চলবেনা। এই বাড়ির একটা সম্মান আছে, বাড়ির বউ স্টেজে উঠে গান করলে মান সম্মান থাকবেনা। নিলয়ের এসব ভালো লাগেনা মা।

মৃন্ময়ী দেবী – ভালো লাগেনা যখন তো তোর গানের গলার বাহবা দিয়ে, তোকে গান শেখানো, ফাংশান করার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে না করলেই পারতো... ছেলেটা হয়েছে একদম বাপের মত। তোর বাবাও আমার শ্রুতি নাটক শুনে আমায় পছন্দ করেছিলো, বিয়ের আগে কত কথা। তুমি নাটক করবে, কবিতা বলবে, আমি নিয়ে যাবো তোমায়

অনুষ্ঠানে। আর বিয়ের রাত পেরোতেই সে কথা কথাই থেকে গেলো বুঝলি। আমার আর কিচ্ছু করা হলনা। এখন ওই 'সঞ্চয়িতা'ই আমার চিরসঙ্গী। কবিতাগুলো নিজে বারবার পড়ি আর মনকে শান্ত করি রবি ঠাকুরের ভাষায়। কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা ধরে আসছিল মৃন্ময়ী দেবীর। রাহি বুঝতে পেরেই মায়ের হাতটা ধরে থাকলো কিছুক্ষন, তারপর দুজনেই নিচে এসে যে যার ঘরে চলে গেল।

সেদিন রাতেই ডাইনিং টেবিলে হঠাৎই কথা তোলেন মৃন্ময়ী দেবী, "বলছি নিলয়, কাল একটু রাহিকে তাড়াতাড়ি সকালে ডেকে দিস তো, সামনেই কলেজের অনুষ্ঠান, রেওয়াজ না করলে গাইবে কি করে?"

নিলয় – রাহি তোমার কাছেও এই নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করেছে বুঝি?

আর তারপর রাহির দিকে তাকিয়ে বেশ ঝাঁঝের সুরেই বলে, আমি তো যা বলার তোমায় বলে দিয়েছি রাহি। আবার এসব...

নিলয়ের কথাটা আর শেষ করতে দেননা মৃন্ময়ী দেবী, আর রাহিকেও কোন উত্তর দিতে না দিয়েই বলে ওঠেন, "কলেজের রিইউনিয়নের চিঠিটা পোস্টম্যান আমার হাতেই দিয়ে গেছিলো নিলয়। আর রাহি আমার সামনে বসেই পড়েছিল চিঠিটা। আমার অবাক লাগছিল কিছুদিন ধরেই চিঠিটা হাতে পাওয়ার পরেও রাহি একবারও গান করতে

বসেনা। আর গত তিনদিন রাতের তোর কিছু কথাও আমার কানে এসেছে।”

নিলয় – তুমি কি আজকাল আমার ঘরে আড়ি পাতছো নাকি?

মৃন্ময়ী দেবী – মুখ সামলে কথা বলো নিলয়। তুমি যে চিৎকার করে কথা বলছো রোজই সেটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। আর প্রথম রাহিকে গান শুনেই তো পছন্দ করেছিলে, তাহলে এখন এসব কেন? এরকম পরিকল্পনা যদি আগে থেকেই তোমার মাথায় ছিল তাহলে রাহিকে বিয়ে না করলেই তো পারতে। মেয়েটার স্বপ্নটা অকালেই ঝরে যেতনা অন্তত। অবশ্য তুমি স্বপ্নের কি বুঝবে? বিয়ে মানে আর কিছু না বোঝো, বৌ-এর ওপর অধিকার বোধ চাপিয়ে দেওয়াটা বেশ বুঝেছো। মেয়েটার যে নিজের একটা জগৎ আছে, স্বাধীনতা আছে সেটা জোর করে বন্ধ না করে দিলে পুরুষমানুষ হয়ে ওঠা যায়না তাইতো?

নিলয় – মা!

মৃন্ময়ী দেবী – একসময় তোমার বাবাও আমার নাটক, কবিতার দরজাটা নিজে হাতে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন তুমিও সেই একই পথে। আমার সাথে যা হয়েছে, এই বাচ্চা মেয়েটার সাথে আমি কিছুতেই সেটা হতে দেবনা। নয় রাহিকে নিজের জগৎ নিয়ে বাঁচতে দাও, নইলে ওকে ওর বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। এর যেকোন একটা পথ তোমায় বেছে নিতে হবে নিলয়।

এইতো চাই

নিলয় – আমাদের বাড়ির একটা মান সম্মান আছে মা। তুমি হয়তো সেটা ভুলে যাচ্ছ।

মৃন্ময়ী দেবী – বাড়ির বউ বাইরে গান গাইলে যদি মান সম্মান নষ্ট হয়, তবে রাহির আর আমার বাপের বাড়ির তো কোন সম্মান নেই, তবে এমন বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে গেলে কেন তুমি?

আর বিয়ে করে একটা মানুষের যাবতীয় ইচ্ছেকে গলা টিপে মেরে ফেলার মধ্যে ঠিক কতটা সম্মান জড়িয়ে আছে আমার জানা নেই নিলয়, এই স্বপ্নগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে সম্মানের সমীকরণটা তুমি আর তোমার বাবা ভালো বলতে পারবে নিশ্চয়ই।

নিলয় আর তার বাবা সুবিমল বাবু আর বিশেষ কথা বাড়ায় না, দু'জনেই বেশ চুপ করেই কোনমতে খেয়ে উঠে যায় ঘরে।

পরদিন ভোরে নিলয় একটু তাড়াতাড়ি উঠে রাহিকে ডেকে দেয়, রাহি উঠতেই বলে, "নাও ফ্রেশ হয়ে রেওয়াজ করতে বসে যাও। অনুষ্ঠানের আর কিন্তু বেশি দিন নেই। তবে তোমার কাছে আজ কিছু চাইবো, দেবে আমায়?"

রাহি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে নিলয়ের দিকে, তার মনে হচ্ছে সে আবার ফিরে পেয়েছে সেই ভালোবাসার মানুষটাকে... তার চোখের দিকে তাকিয়েই সে বলে, "বলো কি চাই তোমার?"

নিলয় – তুমি এখন থেকে রোজ গান গাইবে। আচ্ছা মাকে রাজি করিয়ে আবার কবিতা আর নাটকের দুনিয়ায় ফেরানো

যায়না? কাল জানো প্রথম মায়ের গলায় এত ঝাঁঝ দেখলাম, কিন্তু মনে হলো ওই ঝাঁঝের আড়ালে অনেক কষ্ট থেকে কথাগুলো বললো... দেখোনা একবার চেষ্টা করে, পারবে?

রাহি তখন আর কথা না বাড়িয়ে রেওয়াজে বসে যায়। সেদিন বিকেলে ছাদের গাছগুলোর যত্ন নিতে নিতে মৃন্ময়ী দেবী বলেন, "কি রে গানগুলো প্র্যাক্টিস করছিস তো? ইস যদি তোর রিইউনিয়নে যেতে পারতাম! কি ভালো হতো বলতো?"

রাহি – আমি রিইউনিয়নে যাবো, কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার। তোমাকেও আবার কবিতা, নাটক করতে হবে।

মৃন্ময়ী দেবী – সে আর হয়না রাহি। আমার বয়স কত হয়েছে বলতো! এখন এসব করলে লোকে বলবে বুড়ো বয়সে ভীমরতি।

রাহি – মেয়ের জন্য একটু না হয় লোকের কথা শুনলে। মা প্লিজ। আমরা দু'জনে মিলে একটা ছোট্ট কিছু করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবো। এই সপ্তাহে প্র্যাক্টিস করবো, পরের সপ্তাহে ভিডিওটা বানাবো।

মৃন্ময়ী দেবী আবার কবিতা বলবেন ভেবেই ওনার দুচোখ জলে চিকচিক করছে। সেই সপ্তাহে দুজনেই জোরকদমে প্র্যাক্টিস করে গেলেন। আর তারপর সেইদিন মোবাইলের ভিডিও অন হয়েছে সবে। মৃন্ময়ী দেবীর কণ্ঠে, বর্ষার দিনে চারদিক কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়ে। রবি ঠাকুর তাঁর "অপেক্ষা" কবিতায় মনের সেই স্থবিরতার কথাই বলেছেন, "মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে / মিলায়ে থাকে

মাঠে, / পড়িয়া থাকে তরুর শিরে, / কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে / দাঁড়ায়ে থেকে দীর্ঘ ছায়া / মেলিয়া ঘাটে বাটে।"

আর ঠিক তখনই রাহি গান গেয়ে ওঠে, " আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে / জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না॥"

ওদের শাশুড়ি আর বৌমার ভিডিও দুদিনেই ভাইরাল হয়ে গেলো সোশ্যাল মিডিয়ায়, দুজনেই ভীষন খুশি, একের পর এক ভিডিও তৈরির জন্য দুজনেই সমান তালে রেওয়াজে মেতেছে। আজও দুজনেই ছাদে দাঁড়িয়ে কবিতা আর গানের ছন্দে ডুব দিয়েছে, আকাশে ছড়িয়ে গেছে ওদের কণ্ঠস্বর, মৃন্ময়ী দেবী আর রাহি যেন স্বাধীন হয়েছে আজ, কাছের মানুষগুলোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া স্বাধীনতার ঘ্রান নিচ্ছে প্রাণভরে, আর এসবের মধ্যেই মৃন্ময়ী দেবীর দিকে একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রাহি। আর রাহিকে অমন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে মৃন্ময়ী দেবী বলেন, “কি ভাবছিস রাহি?”

রাহি – ভাবছি ভাগ্যিস তোমার মত এমন শাশুড়ি পেয়েছিলাম আমি। আমি চাই সব মেয়েই যেন এমন শাশুড়ি পায় জীবনে। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

কাকভোরে

প্রণব কুমার বসু

কাঠবিড়ালী ভোরের বেলায়
গেলি কোথায় ধেয়ে?
মনপসন্দ খাবার পেলেই
উঠিস জোরে গেয়ে...

তোর তো দেখি ল্যাজটা মোটা
গোঁফটাও কি আছে?
ছুট্টে পালাস কাছে গেলেই
ধরি আমি পাছে।

দেওয়াল বেয়ে ওপর থেকে
নীচে নামিস পায়ে,
দূরের থেকে দেখে আমার
চমক লাগে গায়ে।

ছোট্ট মুখে কতটুকুই বা
খেতে পারিস তুই?
ভাবতে ভাবতে আমি আমার
বিছানাতেই শুই।। ■

গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন

উৎস

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

(১ম পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

আমি সুদীপ্ত সরকার। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম জগন্নাথপুরে থাকি। এই গ্রামে দিনের প্রথম আলোয় ডাক দেয় ভোরের দোয়েল, ঘুম ভাঙে পাখির কলকাকলিতে, ধানক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় দখিণা বাতাসে, সন্ধ্যা নামতেই পল্লীগ্রামে কোলাহল থেমে যায়; থেমে যায় জীবনের স্পন্দন। দিনে যারা নিশ্চুপ থাকে রাতে তারাই জাগ্রতচিত্তে জেগে ওঠে। জোনাকির আলো আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক হাটুরেকে ঠিক গন্তব্যে ফিরিয়ে আনে। পড়াশুনার সুবাদে আমি রাজশাহীতে থাকি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। লেখালেখি করা একরকম অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার কাছে লেখা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম বলতে গেলে ফেসবুক। রোজ কোন না কোন লেখা ফেসবুকে পোস্ট করি। এছাড়াও, বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করে আমার সময় বেশ ভালোই কাটে। গ্রুপ থেকে বন্ধুও জুটে যায়; বন্ধু বলতে ফেসবুক ফ্রেন্ড আরকি!

জীবন এই একটি কারণে আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়, তা হলো মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়। একটি জীবন

উৎস

আরেকটি জীবনের সঙ্গে কত ভাবে কত উপায়ে জড়িয়ে যেতে পারে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। দেখা হওয়ারও কত রকমফের হয়। চেনা নেই, জানা নেই, বাসে দুম করে একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো; সেই পরিচয় রয়ে গেল আজীবন কিংবা কোন এক বাসস্টপ থেকে প্রথম দেখা; প্রথম শিহরণ। সেই শিহরণের ইতি ঘটলো ছাদনাতলায়। নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটলো; নতুনভাবে পরিচয় ঘটলো এক জীবনের সঙ্গে অপর এক জীবনের; বাঁধা পড়লো সাত পাকে। তেমনি আমারও পরিচয় ঘটেছিল এক গল্পদাদুর সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে। বাসে নয়, ট্রামে নয়, বাজারে নয়, সামনাসামনি ধাক্কা খেয়ে নয়, আত্মীয়তার সুবাদে নয়; আমাদের পরিচয় হয়েছিলো ফেসবুকে।

এভাবেও পরিচয় হয়; এভাবেও একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন ঘনিষ্ঠ হতে পারে সেসব ভাবলে মানবমনের দোলাচলে খেলে যাওয়া রহস্যের কণাটুকু ভেদ করতে পারিনা। সাগরের অতল তলে হাজার মাছের খনিতে ছিপ ফেলে মাছ মারবার মতো অবস্থাকে ফেসবুকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পৃথিবীতে হাজার মানুষের খনির মধ্যে ছিপ ফেলে একটি মানুষ খুঁজে পাওয়ার আনন্দ আর্কিমিডিসের 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলার আনন্দের চেয়ে কম কিছুনা ।

একদিন 'গল্পের সন্ধানে' নামক এক ফেসবুক গ্রুপে একটি গল্প পোস্ট করে বেশ সাড়া পেলাম; সেখানে

শ'খানেক কমেন্টও পড়লো। একজনের কমেন্ট দেখে চোখ আটকে গেল। অবশ্য মন্তব্যটি আহামরি কিছু ছিল না – কিন্তু তার একটা আলাদা মানে ছিল। দাদু মারা যাবার পর থেকে তাঁর একটি কথা আমার সবসময় মনে পড়ে। দাদু সবসময়ই বলতেন, “কূপমণ্ডূক হয়ে থাকবে না; জগৎ চিনতে হলে বাইরে বেরুতেই হবে।”

ভদ্রলোকের মন্তব্যটি ছিল এরকম – “জ্ঞান তৃষ্ণায় বেড়িয়ে পড়ো; কূপমণ্ডূক হইও না।” কমেন্টের রিপ্লাই দিলাম, “আমার দাদুও সবসময় বলতেন, কূপমণ্ডূক হবি না; আপনার কথার সঙ্গে আমার দাদুর কথা মিলে গেল।” উনি আবার রিপ্লাই দিলেন, “আজ থেকে আমরা দাদু-নাতি হয়ে গেলাম।"

সেই থেকে আমরা একে অপরের সঙ্গে দাদু নাতির সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম। রক্তের সম্পর্ক না; দেখা হয়নি, চেনা হয়নি, কেবল পরস্পরকে জেনেছি একটু আধটু কিন্তু পূর্ণ ভরসা ছিল বলে কখনো অপর কেউ মনে হয়নি। তিনিও আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন; এমন বিশ্বাস যে কোন সংকোচ ছাড়া তিনি অনায়সে বাংলাদেশে আসতে পারেন।

এবার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। ওনার নাম পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস ওরফে গল্পদাদু। আমি পিনু দাদু বলেই ডাকি। তিনি আমাকে দীপুদা বলে ডাকেন। বেশ রসিক মানুষ। কথা বলতে গেলে সর্বদাই ওনার রসবোধ উপলব্ধি

করা যায়। গল্প জমলে রসের অন্তরালের মানুষটি স্বমহিমায় বেরিয়ে আসেন।

বর্তমান নিবাস দক্ষিণ-পশ্চিম কোলকাতার ঠাকুরপুকুরে। অবশ্য আদি বাড়ি বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবার হাত ধরে একজন শরণার্থী হয়ে ভারতে গিয়েছিলেন। তখন ওনার বয়স আর কত হবে চার কিংবা পাঁচ। কর্মসূত্রে উনি ছিলেন একজন টুরিস্ট গাইড। নিজেই একটি টুরিস্ট এজেন্সি খুলেছিলেন। ফলে, সারাক্ষণ সেই এজেন্সি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। একজন গাইড হিসেবে ভারতীয় ইতিহাস স্থাপত্যকলার আদি ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে ।

অসম্ভব ছুটতে পারতেন। সকালে কাশ্মীরে ব্রেকফাস্ট তো রাত্রে আন্দামানে ডিনার, আবার পরের দিন আন্দামানে লাঞ্চ তো গুজরাটে ডিনার। এমনি করেই সারা ভারতের প্রতিটি রাজ্যে দৌড়ে বেড়ানো নেহাত শখের বশে নয়; পেশার সুবাদে। এক নিরন্তর ছুটে চলা জীবন; জীবিকার তাগিদে দিক্বিদিক ছুটে চলা। চলমান পৃথিবীর সঙ্গে চলমান গল্পদাদু যেন একই সুতোয় গাঁথা।

এজেন্সি এবং একজন গাইড হিসেবে পেশা নির্বাচন করায় সারা বছরে অবসর মেলে না বললেই চলে। উল্টে যখন ভদ্রসমাজে ছুটি পড়তো তখন তাঁর নিজের ব্যস্ততা আরও দ্বিগুণ বাড়তো।

বিভিন্ন স্থানে বেড়ানোর সুবাদে নানা স্বাদের নানা নামের খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত পরিচিত হতেন। কখনো বা নিজেই ইচ্ছে

করে কিছু স্থান দেখতে গিয়েছিলেন; বেড়াতে নয় স্রেফ আবিষ্কার করতে। উদ্দেশ্য এই স্পটগুলোতে মানুষকে ঘুরিয়ে আনা যায় কিনা তা বোঝা। তাই কখনও ৪৮/৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাইলের পর মাইল মরুভূমির বুকে হেঁটে চলা তো কখনো মাইনাস ১৩ ডিগ্রীতে বাস করার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর ঝুলি পূর্ণ। তাঁর যে এমন এক বৈচিত্র্যময় জীবন ছিল, পিনুদাদুর চেহারা দেখে তা বোঝা যায়না। বয়স আঁচ করা তো যায়ই না। বোঝার উপায় নেই ষাটোর্ধ একজন মানুষের মাঝে কি অফুরন্ত তারুণ্য! মুখটি গৌরবর্ণ; চোখে কী প্রখর দৃষ্টি। একবার তাকলে মনে হয় নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন; ঠোঁটের উপরে কাঁচাপাকা গোঁফটি দাদুকে আরো বিজ্ঞবান হিসেবে প্রমাণে ব্যস্ত, আধপাকা চুলের ছিপছিপে চেহারাটি একটি সুদর্শন অবয়বে প্রস্ফুটিত মুখটি সদ্যজাত পদ্মফুলের মতো মনে হয়; পদ্মের গোলাপি আভার মতো মুখমণ্ডল স্বয়ং দীপ্তি ছড়ায় আর পদ্মপাতার মতো সবুজ তার অন্তরে চিরসবুজের বার্তা বহন করে; অসম্ভব হাঁটার ক্ষমতা আর একবার গল্প জুড়ে দিলে কি সকাল কি বিকেল কোন খবর থাকে না!

এজেন্সির সকল দায়ভার ছেলের হাতে অর্পণ করে পিনুদাদু এখন অনেকটাই মুক্ত। হাতে এখন অফুরন্ত সময়, টুকটাক লেখালেখিও করেন। অজস্র অভিজ্ঞতা আর গল্পের ঝুড়ি থেকে ওনার গল্পের ভান্ডার কখনোই ফুরায় না।

লেখালেখি নিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে আমি পিনুদাদুর শরণাগত হই। সঙ্গে সঙ্গে একটা না একটা উপায় মিলে

যায়। মূলত লেখালেখি নিয়েই বেশি আলাপ হয়; সেখান থেকে ব্যক্তিগত জানাশোনা হতে লাগলো।

একদিন কথা বলতে বলতে জানতে পারলাম আমাদের পাশের গ্রামে তাঁদের আদি বাড়ি ছিল। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে পিনুদাদুর মাঝে মাঝে মনে হতো জীবনে কি যেন একটা অপূর্ণ থেকে গেল। পুরো ভারতবর্ষ দেখেও বারবার মনে হয় কি যেন একটা দেখা হলো না। ইদানীং গ্রামের কথা ভীষণ মনে পড়ে পিনুদাদুর। কখনো কখনো স্বপ্নে ছুটে যান সেই জগন্নাথপুরে; ঘৃলাই নদীর বাঁকে ছুটে চলেন; হাঁটতে থাকেন মেঠো পথ ধরে; দেশ ত্যাগের পর নবান্ন আর কোনদিন করা হয়নি; একসঙ্গে বসে যাত্রাপালা দেখা হয়না কত কাল! এইসবই এখন খুব ভাবায় দাদুকে। তবে সবচেয়ে বেশি করে বাবার কথা বড্ড মনে পড়ে পিনুদাদুর। বাবা চলে যাওয়ার কয়েকদিন আগে ঘুমের ঘোরে বলতেন, "কই রে পিনু জালটা নিয়ে আয়তো বাপ; ঘৃলাইয়ে কি সুন্দর মাছ আইছে।"

বাবার এই কথাটি পিনুদাদু কিছুতেই ভুলতে পারেন না, "পিনু রে, হামার দেশটা তো যাবার খুব মন চাওছো বাপ; ইসস্ একবার যদি যাইতে পারতুম; স্বাধীন দ্যাশটাকে মন ভরি দেখনু হয়।" এরকম আক্ষেপ নিয়ে দাদু তাঁর বাবার চলে যাওয়ার সাক্ষী হয়েছেন। সেই থেকে দাদুর বারবার ইচ্ছে করে জীবদ্দশায় অন্তত একবার জগন্নাথপুর থেকে ঘুরে আসবেন কিন্তু কিছুতেই সময় করতে পারছিলেন না।

...ক্রমশ ■

কথকথা

অমিত কুমার সাহা

যদি পথ পথের খোঁজে
হঠাৎ করেই পথ হারায়,
যদি কথা গানের টানে
সুরের সাথে হাত মেলায়;

যদি চাঁদ একলা আকাশ
অনেকখানি আলোয় ভরে,
যদি মন মনের মাঝে
মনের কাছেই আসতে পারে;

তবেই কলম আপন বেগে
পাগল হয়ে চলতে থাকে,
অস্ফুট সব কথকথা
সুসজ্জিত পাতার ফাঁকে।। ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: সেপ্টেম্বর সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২০।

তিনকড়ির ঘাট

মালা মুখার্জী

গঙ্গার ধারে অনেকটা জায়গা নিয়ে রাণী-রাজ্যেশ্বরী মহাবিদ্যালয়, এই জেলা-শহরের একমাত্র ইভনিং কলেজ, তন্নিষ্ঠার কলেজ। বাবা থাকলে অবশ্য ও ডে-সেকশনেই ভর্তি হত, কিন্তু সকালে যে বুটিকের দোকানটা খুলতে হয়, ওটাই ওদের মা-মেয়ের রুজি-রোটি যোগায়। যাকগে সবার সব কিছু হয় না। দুপুরবেলা বইয়ের ব্যাগটা গোছাতে গোছাতে ভাবছিল তন্নিষ্ঠা, হঠাৎ মায়ের গলা শুনতে পেল, "আজ তাড়াতাড়ি যাচ্ছিস যে?"

তন্নিষ্ঠা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আসলে কি জানো তো ওই গঙ্গার ঘাটের রাস্তা দিয়ে গেলে হেঁটেই যাওয়া যায়, আর বিকেলে ওপথে যাওয়া যায় না, তাই..."

কথাটা সত্যি, গঙ্গার ধারের পুরানো রাজবাড়ীর বিল্ডিংয়ে সকাল সন্ধ্যে কলেজ বসে, কিন্তু লাগোয়া ঘাটটি যাকে সকলে তিনকড়ির ঘাট বা পুরানো শ্মশান বলে তার দিকে চাইবার ক্ষমতা বোধহয় সূর্য্যাস্তের পর কারোরই নেই। কথিত আছে, কোনো এক রাজবধূর গুপ্ত প্রেমিক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ওই শ্মশানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রেমিকাকে নিয়ে পলায়নের মুহুর্তে রাজাবাহাদুরের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন তিনি, মরার আগে সেই প্রেমিকও রাজাকে গুলিবিদ্ধ করেন। রাজবধূটি

গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। সেই যুবকের নামেই পুরানো শ্মশান ঘাটকে লোকে তিনকড়ির ঘাট বলে। কলেজে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা এই শ্মশানের গা ঘেঁষে, আর ঘুরপথ হলো বড়রাস্তা, রাতে ও পথেই তন্নিষ্ঠাকে ফিরতে হয় বাসে করে।

"আজ যাওয়াটা জরুরি?" মায়ের গলার স্বরে চাপা উদ্বেগ। কালকের ঘটনাটা মাকে না জানালেও কেমন করে যেন মা জেনে গেছেন।

"আঃ মা, কয়েকটা ছেলে কি বলেছে তার জন্য কলেজ যাবো না? ইকনমেট্রিক্সের ক্লাস আছে।" তন্নিষ্ঠা কাল বিকেলের ঘটনাটা ভুলতে চায়। কলেজ থেকে ফেরার সময় ও বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, যদি ভাগ্যক্রমে বাস বা রিক্সা পাওয়া যায়, ঠিক তখনই একদল বাইক আরোহী ছেলে কিছু ইঙ্গিতবাহী টিপ্পনি ছুঁড়ে বেরিয়ে গেল।

এমনটা দিন কয়েক ধরেই হচ্ছে, তন্নিষ্ঠা পাত্তা দেয়নি, কাল তো একজন ওড়না ছোঁওয়ারও চেষ্টা করেছে। ও জানে এ বাইকবাহিনী কার... ভিকি, এই পাড়ার গুণ্ডা। এরা যে মেয়েকে একবার টার্গেট করে তাকে শেষ পর্যন্ত সারেণ্ডার করতেই হয়। আর তারপর... কারোর লাশ পাওয়া যায়, কারো সেটাও পাওয়া যায় না। কথাটা বোধহয় হাওয়ায় ভেসে মায়ের কানে গেছে। তবে ভয়ে গুটিয়ে থাকলে তো চলবে না, তাই তন্নিষ্ঠা মায়ের ভয়কে উপেক্ষা করেই বেরিয়ে এল।

ক্লাস শেষ হতে দেরী হলো। ইভনিং কলেজে মেয়ে বিশেষ নেই, তাই একসাথে ফেরার প্রশ্নই নেই। ও বাসের ভরসায় না থেকে রিক্সা ডাকতে যাবে তখনই চোখে পড়ল দামী একটা গাড়ী ওর দিকেই আসছে। তন্নিষ্ঠা বিপদের গন্ধ পেয়ে কলেজের পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। ওর অনুমান সত্য, ভিকি আর তার তিনজন বন্ধু ওকেই খুঁজছে। ওরা নিশ্চিত বাস স্ট্যাণ্ডে তন্নিষ্ঠা ছিলই।

"গুরু, ওই গলিটা দেখবে না?" ভিকির সঙ্গীর কথা শুনে তন্নিষ্ঠা ভুল করে বসল। হুড়মুড়িয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্ধকার গলিতে ছুটতে লাগল। ভিকি গলিটায় ঢুকতে যেতেই ওর আর এক সঙ্গী বলে উঠল, "ওই ভুতুড়ে শ্মশান ঘাটটা ওদিকেই না?"

তন্নিষ্ঠাও যে কথাটা জানে না তা নয়। তবে এ মুহুর্তে মানুষের চেয়ে পরিত্যক্ত শ্মশান নিরাপদ মনে হলো। অনেকটা দৌড়নোর পর তন্নিষ্ঠার মুখে গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতেই ও নিজেকে শ্মশান ঘাটে আবিষ্কার করল। কথিত আছে তিনকড়ির আত্মা আজও এখানে জাগ্রত, তাই সন্ধ্যের পর, বিশেষত অমাবস্যার রাতে কেউ এ চত্বর মাড়ায় না। হয়তো ভিকির দলও মাড়াবে না, তন্নিষ্ঠা আকাশের দিকে তাকলো। নির্মেঘ আকাশে চাঁদ নেই, আজ কি অমাবস্যা? তবে বিষয়টা অত সহজ হলো না, খুব শিগগিরি ও বুঝলো গুণ্ডারা ভুতের ভয় পায় না। ভিকি

ও তার বন্ধুরা এগিয়ে আসছে, শুকনো পাতায় ওদের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ভিকির গলার আওয়াজ পেল তন্নিষ্ঠা, "আজ কৃষ্ণকলি আমার না হলে অ্যাসিড ঢেলে দেবো ওই কালো চামড়ায়..."

তন্নিষ্ঠা ভয়ে ভয়ে তাকালো, পরিত্যক্ত শ্মশানে একটা বুড়ো বটগাছ, চারপাশে ঝুরি হয়ে কেমন গুহার মতো হয়ে আছে। অনেকটা পরিসর জুড়ে এই বটগাছটি। তন্নিষ্ঠা গাছের ঝুরির আড়ালে আশ্রয় নিতেই দেখতে পেল গাছের কোটরটা। ও এখানে লুকোতে পারবে। তবে ওরা যদি এখানে আসে, তাহলে খুব সহজেই ওকে পেয়ে যাবে!

গাছের কোটরের ভিতরে হোমকুণ্ড এখনো প্রজ্জ্বলিত আর তার সামনে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে তন্নিষ্ঠা হোমকুণ্ডের কাছে এল। জলদগম্ভীর কণ্ঠে 'কালী কালী শুনে' ও পিছন ঘুরে তাকাল। রক্তাম্বর পরিহিত এক লম্বা চওড়া দাড়িওলা তান্ত্রিক কোটরে ঢুকে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসলেন।

তন্নিষ্ঠা হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "বাবা, আমায় শরণ দিন..." আশ্চর্য, উনি বোধহয় তন্নিষ্ঠাকে দেখতে পাননি! তান্ত্রিক বলে উঠলেন, "চন্দ্রা, আমি তিনকড়ি, তোমার তিনুদা!" তান্ত্রিক নিজের নকল দাড়ি-গোঁফ খুলতেই এক পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবকের চেহারা বেরিয়ে এল। তন্নিষ্ঠা অবাক হলেও ওর গলা দিয়ে বেরোলো এক অন্য স্বর, "তিনুদা, তুমি এখানে?"

"হ্যাঁ, আমিই তোমার দাসীকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম," তন্নিষ্ঠা এমনভাবে ওনার কথা শুনছে যেন ও ওনাকে চেনে। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে তন্নিষ্ঠা অবাক হয়ে গেল, কি দামী শাড়ি-গয়না ওর গায়ে!

"চলো চন্দ্রা, আমি তোমায় নতুন করে বাঁচার আশা দেব..."

"রাজাবাবু জানলে তোমায় মেরে ফেলবেন তিনুদা," তন্নিষ্ঠা বলল, "তোমার চন্দ্রা আজ রাণী চন্দ্রাবতী," তন্নিষ্ঠার গলায় এক অচেনা অভিমান, "তুমি যদি আমায় বিয়ে করতে তাহলে আমার জীবন অন্যরকম হতো..."

"চন্দ্রা, আমি কায়েতের ছেলে, তুমি বামুনের মেয়ে। সামাজিক বিয়ে হতো না..."

চন্দ্রাবতীকে এক প্রকার জোর করেই কোটর থেকে বার করে আনল তিনকড়ি, "টাকার যোগাড় করেছি, ওই দেখ ঘাটে নৌকো বাঁধা..."

চন্দ্রাবতী নিঃসঙ্কোচে তিনকড়ির সাথে নৌকার দিকে পা বাড়াতেই ভিকির গলার আওয়াজ পেল, "ওই তো মেয়েটা, গঙ্গার জলে ঝাঁপাবে নাকি?"

ভিকির পিস্তল গর্জে উঠল। তিনকড়ি বলল, "রাজাবাবুকে কেউ খবর দিয়েছে, চন্দ্রা। তুমি নৌকায় ওঠো..." তিনকড়ি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, ওর হাতেও পিস্তল, কিন্তু ভিকির দল নরকঙ্কাল দেখে আঁতকে উঠল। "আমি থাকতে চন্দ্রার কিছু হবে না..."

তন্নিষ্ঠা অগ্র-পশ্চাদ না ভেবে নৌকায় উঠতেই ও গভীর জলে পড়ে গেল। কতক্ষণ ঠাণ্ডা জলে হাঁকপাক করছিল তা ও জানে না, মনে হলো কেউ যেন ওকে জল থেকে টেনে তুলছে, "স্যার, ওই পুরনো শ্মশানের দিকে গুলির শব্দ হয়েছে, মেয়েটা মনে হয় ওদের কবল থেকে ভাগতেই জলে ঝাঁপ দিয়েছে..." পুলিশের বোটে তন্নিষ্ঠার ক্লান্ত দেহটা তুলতেই ও পুরোপুরি জ্ঞান হারাল।

কতক্ষণ ও অজ্ঞান ছিল জানে না, হাসপাতালের বেডে জ্ঞান আসতেই মা ডুকরে উঠলেন, "বারণ করেছিলাম বেরতে, শুনলি না তো!"

তন্নিষ্ঠা কিছু বলার আগেই হসপিটালের বাইরে থেকে অনেক লোকের গলা পাওয়া গেল, বোধহয় মড়া যাচ্ছে। মা বললেন, "পরশু ভিকি-গুণ্ডা আর তার দলবল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরেছে, পুরনো শ্মশানে ওদের ডেড বডি পাওয়া গেছে, ওদেরই শবযাত্রা।"

"তিনকড়ির ঘাটে, নাগো?" তন্নিষ্ঠার মা চমকে উঠলেন, "নাম করিস না, মা। হ্যাঁরে তুই কি কিছু দেখেছিস?" তন্নিষ্ঠা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না।" ■
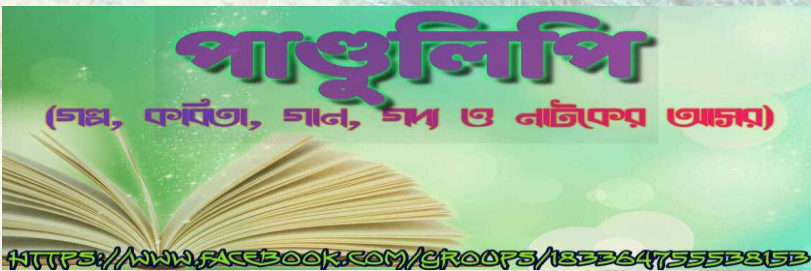
অশনি সংকেত

সিদ্ধার্থ বসু

কোভিড ১৯ সংক্রমণ
অবকীর্ণ গোটা বিশ্বজুড়ে,
রুজি ভুলে অন্তরিন হয়েছি
মাস্ক দস্তানায় মুড়ে,
অকুলান সঞ্চয় ভাড়াড়ে অবক্ষয়,
দিন-মজুর হত-ভাগ্যদের পাশে থাকতে কেউ পেওনা ভয়।

ভুলেছি আড্ডা, ছেড়েছি অকারণ টহলদারি,
সংক্রমিত মনেও ফেবুতে* দেখাচ্ছি বাহাদুরি,
ধুলোঝেড়ে বইয়ে ডুব দিয়ে কেউবা মনি মুক্তো কুড়োচ্ছে,
কেউবা অসীম প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হচ্ছে।

ভালো মন্দের আলো আঁধারিতে জীবন আলোকিত,
জোছনামাখা শিশির ফোঁটায় ভিজে মন বিশুদ্ধ,
সংক্রমনের আশংকায় ঈশ্বরও যে ভীত,
অবোধ সুখচরেরা সামাজিক অনু-বিধান লঙ্ঘিত করছে অবিরত।

ঘরে বসেও দেশ সেবার সুবর্ণ সুযোগ,
দৃঢ় সংকল্পে ব্রতী হও ঘুচবে দুর্ভোগ,

ভবিতব্য

অহর্নিশ ডাক্তার, পুলিশ, সমাজসেবীরাও সদয়,
ছকে বাঁধা জীবন ছেড়ে হও রে অভয়।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন একসুত্রে বাঁধন,
জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একতাই বল মাতৃসেবায় বড্ড প্রয়োজন।

অক্ষয় হোক বেঁচে থাকার স্বপ্ন,
অক্ষয় হোক সুখ আনন্দ ভালোবাসা,
মুছে যাক আতঙ্কিত,
আশঙ্কায় ভরা জীবন এটুকুই আশা।

* ফেবুতে = ফেস বুকেতে ■

ধারাবাহিক গল্প

শেষ রাতের মরীচিকা

স্বাগতা পাঠক

(১)

আজ সকাল থেকেই অনবরত বৃষ্টি হয়েই চলেছে। "এই একটা দিনই অফিসের ছুটি, বন্ধুদের সাথে যে একটু আড্ডা দিতে যাবো তারও উপায় নেই।" বেশ বিরক্তি নিয়ে বলে উঠল সব্যসাচী...

সব্যসাচী রায়, বয়স ৩২ বছর, ভবানীপুরে একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বিগত পাঁচ বছর ধরে কাজ করছে। একা মানুষের সংসার, বেসিকালি সব্যসাচী নর্থ বেঙ্গলের ছেলে। সেই ২৫ বছর বয়েসে, পড়াশুনার সূত্রেই তার প্রথম কোলকতায় আসা। তখন থেকেই কোলকাতাই তার সবকিছু। তারপর এখানেই চাকরি আর এইখানেই একটা ফ্ল্যাট কিনে স্থায়ী ভাবে রয়ে যাওয়া। সব্যসাচীর বাবা নর্থ বেঙ্গলের রেল কর্মচারি। মা মারা যান অনেক ছোটবেলায়। তারপর বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সৎ মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা খুব একটা ভালো ছিল না। যেমন হয়ে থাকে আরকি, সতীনের ছেলেকে নিজের বলে কোনো দিন মেনে নিতে পারেননি সব্যসাচীর দ্বিতীয় মা। তবে বাবার স্নেহে তখনও ঘাটতি আসেনি। কিন্তু মানুষের মনতো, কি আর করা যায়!

ধারাবাহিক গল্প

সব্যসাচীর দ্বিতীয় মায়ের যখন সন্তান হয়, তখন থেকেই তার বাবার ব্যবহারেও অনেক পরিবর্তন আসে। মাঝপথে তার পড়াশোনা ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার মা, মানে সৎ মা। কিন্তু ছেলের জেদের কাছে হার মানে পরিবার। নিজের খরচ নিজে চালিয়ে সব্যসাচী মাস্টার্স কমপ্লিট করে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি থেকে। তারপর চলে আসে কোলকাতায়, চাকরির পড়াশোনা করার জন্য। সেই পড়াশোনার জন্যও সে নিজের পরিবার থেকে কোনো রকম সাহায্য পায়নি।

কোলকাতায় এসে নিজের উদ্যোগে, এক বন্ধুর সাহায্যে গোটা ২৫ স্টুডেন্ট জোগাড় করে, সে শুধু টিউশন করত একসময়। একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া, নিজের খাওয়া-দাওয়া আর একটি নামজাদা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার খড়চ, এসব তখন তাতে ভালোই চলে যেত। কোলকাতার বুকে বসে সিবিএসসি বোর্ডএর ছাত্র-ছাত্রী পড়াত সে।

তারপর দু'বছরের মধ্যেই একটা বিরাট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজও পেয়ে যায় সে। স্যালারি বেশ ভালো। আগে কোম্পানির ফ্ল্যাটে থাকত, তবে তিন বছর পর স্যালারি বাড়লে, হোম লোন নিয়ে আর নিজের কিছু সেভিংস যোগ করে, সে নিজের একটা ফ্ল্যাট কিনে নেয়। এই তিন মাস হল সব্যসাচী নতুন ফ্ল্যাটে এসেছে। সত্যি বলতে তার বাড়িতে কারো প্রতি তেমন টান নেই। তবে তার একটা ছোট্ট বোন আছে, ঐ সৎ মায়ের মেয়ে, তাকে সে খুব ভালবাসে।

মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যায় সব্যসাচী। রাখি, ভাই ফোঁটা এইগুলোতে মনে করে বোনের জন্য উপহার পাঠিয়ে দেয় সে। বোনটিও তাকে খুব ভালবাসে। তবে তার খুব রাগ তার দাদা তার সাথে দেখা করতে আসেনা। শেষ বার গিয়েছিল দু'বছর আগে। আসলে, সৎ মা পছন্দ করেন না সব্যসাচী বাড়িতে আসুক।

সৎ মায়ের দুই সন্তান, সব মিলে ওরা তিন ভাইবোন। মাঝে মাঝে ওর সৎ মা সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা করতেন। শেষবার গিয়ে সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে এসেছে সে। নিজের ভাগের সম্পত্তিও ছোটবোনের নামে করে দিয়ে চলে এসেছে। সব পাট চুকিয়ে এসেছে, সে আর কোনোদিন নর্থ বেঙ্গল যাবে না। শুধু মাঝে মাঝে বোনের কথা মনে পড়ে, তখন হয় ভিডিও কল বা ফোনে কথা বলে নেয়। বোন বলেছে সে হাইয়ার স্টাডি করতে কোলকাতায় আসবে। কিন্তু ওর মা ওকে আসতে দিতে চায় না।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সব্যসাচীর মতো এমন ভদ্র ছেলে নেই বললেই চলে। কোনো রকমের বাজে নেশা নেই। তবে মাঝে মাঝে ওই সিগারেট খায় দু'টো একটা, এই যা। কোনো বাজে সঙ্গ নেই, হাতে গোনা কয়েকজন বন্ধু। তাদের কয়েকজনের বিয়েও হয়ে গেছে। কয়েকজনের হয়নি। সব্যসাচী একটা প্রেমও করে না। তাই বন্ধুরা উদ্যোগ নিয়েছে ওর জন্য পাত্রী দেখে তাড়াতাড়ি ওর বিয়েটা দিয়ে দেবে।

দিনটি ছিল ২০ জুলাই। রবিবার অফিস ছুটি। এই ছুটির দিনগুলো বিকেল থেকে সন্ধ্যে অবধি চায়ের দোকানে বসে সব্যসাচী বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। সারা সপ্তাহের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর, এই একটা দিনই সে রিফ্রেশমেন্ট পায়। কিন্তু প্রকৃতি আজ আর সঙ্গ দিচ্ছে না। আগে অফিসের কাছে যে ফ্ল্যাটটায় ছিল, সেখান থেকে চায়ের দোকান মানে ওর আড্ডা দেওয়ার জায়গাটা ছিল একদম কাছে। তবে এখন যেখানে সে নতুন বাড়িটা নিয়েছে, সেখান থেকে প্রায় ২০ মিনিট হাঁটা পথ। বৃষ্টির যা তোড়জোড়, তা দেখে আজ ও বাজারেও যায়নি, ঘরে যা ছিল তা দিয়ে মোটামুটি ওই কোনো রকম খিচুরী আর আলুভাজা রান্না করে খেয়েছে। বর্ষাকালে এটাই আইডিয়াল খাবার।

রনি ফোন করেছিল, আজ আড্ডাতে যাবে কি না, সেটা জানার জন্য। সব্যসাচী ঠিকঠাক কিছু বলতে পারেনি। বলেছে বৃষ্টি কমলে জানাচ্ছে, তবে বৃষ্টির যা অবস্থা তাতে মনে হয় না এ কমবার নাম নেবে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনটে সিগারেট শেষ করে দিল সে। বেশ মনমরা হয়ে পড়ল সব্যসাচী। এপার্টমেন্টের নীচের গ্রাউন্ডটা আজ পুরো ফাঁকা, কেউ বের হয়নি। গার্ডটাও নিজের ঘরে বসে বেস ঘুম দিচ্ছে নিশ্চয়ই। এই নতুন বাড়িতে আসার পর থেকেই কেন কে জানে সব্যসাচীর কিছুই ভালো লাগে না। আসলে আগের ফ্ল্যাটে বিগত পাঁচ বছর ছিল সেখানে একটা মায়া পড়ে গেছে। এইখানকার

এই ফ্ল্যাটটা খুব কম দামে পাওয়াতে, ও আর বেশি কিছু ভাবেনি। দেখতে দেখতে ৫ টা বেজে গেলো কিন্তু বাইরে দেখে মনে হচ্ছে সন্ধ্যে ৭ টা হবে।

কালো মেঘে যেন পুরো পরিবেশ ঢেকে আছে। আর তার সাথে চলছে প্রবল বৃষ্টি। এর মধ্যে আর কারো ফোন আসেনি। তার মানে কেউ মনে হয় আজ আর আড্ডায় আসবে না। এই ভেবে সে উঠে রান্না ঘরে গেল। একটু চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে এল। মিনিট পাঁচেক পর, সব্যসাচী চা আর এক প্লেট বিস্কুট নিয়ে এসে বসার ঘরের সোফাটাতে বসল টিভিটা চালিয়ে। ভালো কোনো ফিল্মও হচ্ছে না। একটা দু'টো করে চ্যানেল ঘুরিয়ে সে দেখতে লাগল। হঠাৎ বইএর তাকের উপর রাখা ফোনটা চোখে পড়ল... মনে হল সেটা জ্বলে উঠল। হয়তো কোনো ম্যাসেজ এসেছে, থাক, সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশনও হতে পারে, নেটটা অন আছে। সব্যসাচী অতটা মাথা ঘামালো না।

প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে যেতে, আবার চোখ পড়ল ফোনটার দিকে সেটা এখন আরও একবার জ্বলে উঠল। এবারও ইগনোর করে টিভির দিকে মুখ ঘোরাল সে। কিন্তু এবার খুব আগ্রহ জাগল, কে মেসেজ পাঠাচ্ছে! উঠে গিয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে লক স্ক্রীনটা খুলে দেখল দুটো আনরেড মেসেজ। রনি পাঠিয়েছে, "বৃষ্টিটা একটু থেমেছে আমি বেরোলাম তুইও বিসু কাকুর চায়ের দোকানে চলে আয়।"

আরও একটা মেসেজ এই একই কথা লেখা। সব্যসাচী রনির ফোনে কল করল, নম্বরটা অফ আছে। সেকি, এই তো মেসেজ করল, এখন আবার অফ! সে কি করবে বুঝে উঠেতে পারল না। বাইরে বৃষ্টির গতি একটুও কমেনি বরং বেড়েছে বললেই চলে।

চায়ের দোকানের আড্ডায় রনি, অমিত, আর সব্যসাচীই যায়। অমিত বলে দিয়েছিল ও আজ আর আসবে না। সন্ধ্যে হবার পর সব্যসাচীও মনস্থির করেছিল আজ আর যাওয়া হবে না, তবে রনির মেসেজটা তাকে বড় বিপদে ফেলল। আর এই দিকে ওর ফোনটাও বন্ধ। একবার অমিতকে ফোন করবে? রনি ওকেও মেসেজ করেছে কিনা ও যাচ্ছে কিনা...? অমিতকে ফোন করাটাও বৃথা হল...। ফোন নট্ রিচেবল...

এই দুর্যোগের সময় কারো ফোন যে ঠিকঠাক কানেকশন পাবে না, সেটা আর নতুন কি? কিন্তু এখন সব্যসাচী কি করবে? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সে জামাপ্যান্ট পরে তৈরী হল। রনি এসে ঘুরে যাবে। যদিও খুব বেশি প্রবলেমে না পড়লে সব্যসাচীও কোনো দিন বিসু কাকার দোকেনের আড্ডা মিস করেনি, তবুও আজ এই বৃষ্টির হাল দেখে সেও আশা ছেড়ে দিয়েছিল। তবে রনির এই মেসেজে সে এখন রীতিমত কনফিউসড। ফোনেও ব্যাটাকে পাচ্ছে না। জিন্সের প্যান্টটা গুটিয়ে নিল সব্যসাচী। হাতে একটা ছাতা ফোনটা একটা পলিথিনের প্যাকেটে ঢুকিয়ে সে নিজের পকেটে রাখল।

ধারাবাহিক গল্প

সব্যসাচী ফোর্থ ফ্লোরে থাকে। সৌভাগ্যবসত ওদের এপার্টমেন্টে জেনেটারের ব্যবস্থা আছে সারাদিন লোড শেডিং থাকলেও সন্ধ্যে বেলা চালিয়ে দেওয়া হয় জেনারেটর, তাতে লিফটও চলে। নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে পাশের করিডোরটা পুরো ফাঁকা দেখে তার মন হল যে -- সে এক জনশূন্য প্রাণহীন এপার্টমেন্টে একা দাঁড়িয়ে আছে। শুধু কানে আসছে বাতাসের তীব্র শব্দ আর বৃষ্টির আওয়াজ। লিফটে করে সে নেমে গেল। একই রকম ভাবে নীচে এসে পুরো গ্রাউন্ডটা ফাঁকা দেখেও তার আবারও তাই মনে হল।

শুধু কিছু কিছু ঘরের জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। গেটের কাছে এসে সব্যসাচী গার্ড এর ঘরটার দিকে উঁকি দিল, না ব্যাটা নেই। তার মানে আজ ডুব মেরেছে। এইভাবে না বলে ডুব মারার কোনো মানে হয়! গেট থেকে বেরিয়ে এসে সে রাস্তার দুপাশে তাকাল। না কোনো গাড়ির দেখা নেই, বাস বা লড়ি তো দূর, একটা রিক্সা ভ্যানেরও দেখা নেই। অন্য দিন সে হেঁটেই বিসু কাকার দোকানে যায়, তবে আজ আর হেঁটে এতো দুর যেতে মন চাইছিল না। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে কোনো কিছুর দেখা না পেয়ে, অগত্যা সে হাঁটা শুরু করল। রাস্তায় যদিও কয়েকটা আলো জ্বলছে, তবুও এই ভর সন্ধ্যেবেলায়, প্রায় পুরো রাস্তাটাই শুনশান। একটাও লোকজন নেই, দেখে মন হচ্ছে – সে মধ্য রাতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। বড় বড় বহুতলের কিছু কিছু

ঘরে আলো জ্বলছে। হাতে গোনা কয়েকটা দোকান খোলা। মাঝে মধ্যে হঠাৎ করেই দুই একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে ঝড়ের গতিতে। পায়ে হাঁটা লোকজন বলতে এখনও পর্যন্ত শুধু সব্যসাচী নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না।

বৃষ্টির গতিটাও বেড়েছে আর দাঁড়ানোর কোনো জায়গাও নেই। "না একবারে গিয়ে ওই চায়ের দোকানেই দাঁড়াবো।" এই ভেবে সব্যসাচী আরো দ্রুত পা চালাল। রাস্তায় খুব বেশি জল না জমলেও পায়ের পাতা ডুবে যাওয়ার মত জল জমেছে। আর হাঁটার সময় সেটাই বেশ একটা অদ্ভুত আওয়াজ করছে। একটা সিগারেট ধরবার চেষ্টা করে সব্যসাচী ব্যর্থ হয়ে বলল, "যেমন বৃষ্টি তেমন হওয়া, না... কোনো চান্স নেই... থাক আর তো কিছুক্ষন চলে এসেছি প্রায়।"

বড় রাস্তা পেরিয়ে ডান হাতে ঢুকতে হবে তারপর ২ নম্বর গলি ছেড়ে ৩ নম্বর গলির মুখে বিসু কাকার দোকান। আজব কান্ড এই দিকের স্ট্রীট লাইটগুলো সব অফ। ফোনটাও প্লাস্টিকে জড়িয়ে পকেটে রাখা, আলো জ্বালিয়ে হাঁটবে তার উপায় নেই, এখন পকেট থেকে বের করতে গেলে ঝামেলা। আন্দাজ করে সব্যসাচী এগিয়ে গেল। এই রাস্তাগুলো ও চেনে, তাই খুব একটা চিন্তা নেই। তবে এই কলকাতার রাস্তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সব রাস্তাগুলো প্রায় একরকম দেখতে। প্রথমবার কেউ আসলে ভুল হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি। আশপাশের কয়েকটা

ধারাবাহিক গল্প

দোতলা, তিনতলা বাড়ি থেকে যতটুকু আলো আসছে তাতেই ঠাহর করে সব্যসাচী এগিয়ে গেল। যেখানে চায়ের দোকানটা থাকার কথা কই নেই তো! এই গলির মুখেই তো থাকার কথা ওর খুব পরিচিত চায়ের দোকান। তবে কি সে রাস্তা ভুল করে অন্য গলিতে ঢুকলো! ...ক্রমশ ■
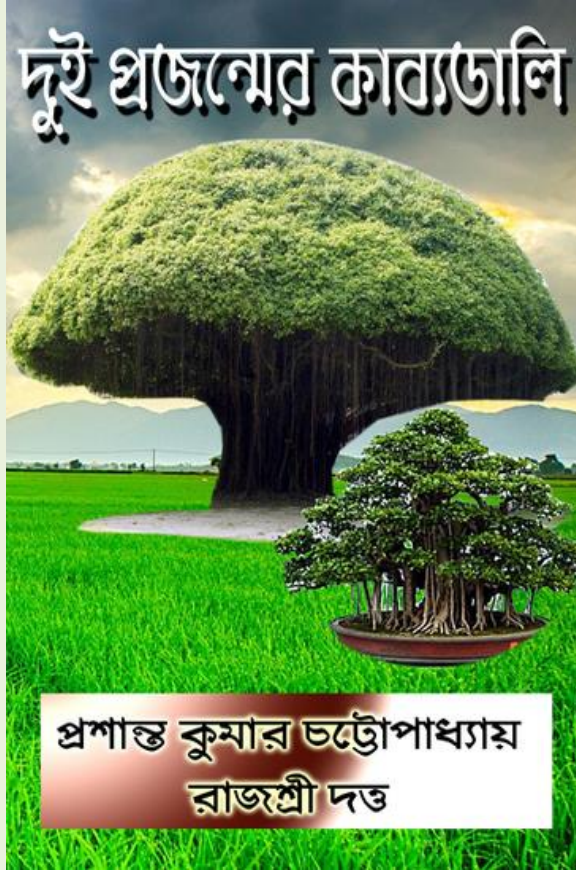
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

বিশ্বাসের কানাগলিতে উপচে পড়া ভীড়

জালাল উদ্দিন লস্কর শাহীন (বাংলাদেশ)

কার কাছে শুনেছে চমকপুরের চান্দু কবিরাজের 'পড়াপানি' জাদুর মতো কাজ করে। তেলপোড়াও না কি দেয়। তাই স্বামী কফিলউদ্দিনকে বারবার সেখানে যেতে অনুরোধ করছে জুলেখা। জুলেখার বিয়ে হয়েছে তিন বছর। বাচ্চা হয় না বলে শাশুড়ি ননদেরা খোটা দেয়। তাই চান্দু কবিরাজের পড়া পানি খেয়ে যদি আশা পূরণ হয় মন্দ কি! যাবে যাবে করে কফিলউদ্দিনের আর চমকপুর যাওয়া হয়ে উঠে না।

প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চমকপুরের চান্দু কবিরাজের এখানে এসে ধর্না দেয়। ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ঘেষা চমকপুর এমনিতেই পুরানো ঐতিহ্যবাহী একটি গ্রাম। চান্দু কবিরাজের নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে বেশী দিন হয়নি। তবে এখন সারাদেশের মানুষ চান্দু কবিরাজকে চেনে। পেপার ও পত্রিকায় চান্দু কবিরাজের পড়াপানি আর তেলপড়ার তেলেসমাতি কাজকারবার নিয়ে একটার পর একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েই চলেছে। দেশের নানান প্রান্ত থেকে মানুষ

প্ল্যাসিবো

পাগলের মতো ছুটে চলেছে চান্দু কবিরাজের গ্রাম চমকপুরের দিকে। চমকপুর নামটাও এখন একটা ব্র্যান্ড। চমকপুর এবং চান্দু কবিরাজ এখন সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহাসড়কের উভয়দিকে ৩/৪ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে হরদম যানজট লেগেই থাকে। লোকজনের প্রচন্ড ভীড়। পা ফেলবারও জায়গা পাওয়া যায় না। স্বেচ্ছাসেবকেরা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে যাতে কোনো দুর্ঘটনা বা অনাকাঙ্খিত ঘটনা এখানে না ঘটে। চান্দু কবিরাজের কাছে দূরদূরান্ত থেকে আসা ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষজন যাতে অন্তত দু'মুঠো খাবার কিনে খেতে পারে সেজন্য গড়ে উঠেছে অনেক অস্থায়ী হোটেল বা রেস্টুরেন্ট, সাথে সাথে বোতলজাত পানি ও তেলের অজস্র দোকান। সব কিছুরই দাম খুব চড়া। দ্বিগুনেরও বেশী দাম দিয়ে কিনতেও আগত মানুষদের কোনো দ্বিধা নেই। বেশী টাকা খোয়ানোর দুঃশ্চিন্তাও নেই। সবার চাওয়া একটাই। কখন ভীড় ঠেলে চান্দু কবিরাজের কাছাকাছি গিয়ে সংক্ষেপে নিজের সমস্যার কথা বলে তেলের কিংবা পানির বোতলটা এগিয়ে দিতে পারবে। তারপর কবিরাজ তাতে কিছু একটা পড়ে ফুঁ দিয়ে দেবে। কবিরাজের ফুঁ লাগার পরই বোতলের তেল-পানি আর সাধারণ তেল-পানি থাকে না। ম্যাজিক তৈরী হয় তেল আর পানিতে। এমনটাই বিশ্বাস লোকজনের। তারপর এই ম্যাজিকাল তেল আর পানি ব্যবহারে ধন্বন্তরী ফল পাওয়া যায় হাতে হাতে। কেউ আজ

পর্যন্ত ফল পেয়েছে কি না সে প্রমাণ কারো কাছে না থাকলেও এক প্রবল অন্ধ বিশ্বাস আর আবেগের আতিশয্যে লোকজনের এই ভীড় আজ নতুন নয়। গত ছয় মাস ধরেই এমনটা চলছে।

চমকপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজিমুল হকও বেজায় খুশী। তাঁর ইউনিয়নের একটি গ্রাম চমকপুর এখন সারাদেশে এক ডাকে পরিচিত। জাতীয় সংবাদপত্রে খবর প্রচারিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেকগুলো ইলেকট্রনিক মিডিয়া রাজধানী থেকে চমকপুরের মতো অজ পাড়াগাঁয়ে এসে চান্দু কবিরাজের সাথে কথা বলেছে। হাজারো জনতার ভীড়ের দৃশ্য ভিডিও করেছে। ভিন জেলা থেকে আগত দু-চারজনের মতামতও ধারণ করেছে ভিডিওতে। টেলিভিশনে সেসব প্রচারের পর চান্দু কবিরাজের খ্যাতি এখন রীতিমতো আকাশছোঁয়া।

এসব মিডিয়া স্থানীয় চেয়ারম্যান আজিমুল হকের সাথেও কথা বলে। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে এখন প্রায়ই চেয়ারম্যানের চেহারাও দেখা যায়, চেয়ারম্যানেরও ভালোই লাগে। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করে দিয়েছেন। দিনেদিনে আগত লোকদের ভীড় বাড়তে থাকায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য এতোদিনে এসে তিনশো তেত্রিশ জনে দাঁড়িয়েছে!

প্ল্যাসিবো

চান্দু কবিরাজের বড় গুন তিনি তেল বা পানি পড়া দেওয়ার বিনিময়ে একটা কানাকড়িও দাবী করেন না। কেউ জোর করে দিতে চাইলেও নেন না। এ কারণে তাঁর সুনামের শেষ নেই। তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি ভালোবাসারও কমতি নেই। একথা কেউই বলতে পারে না আগে একবার এখানে আসা লোকজন আবার কখনও এসেছেন। তবুও প্রতিদিন আগত লোকজনের ভীড় সামলানো রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে! দেখতে সহজ সরল সাদাসিদা ধরনের চান্দু কবিরাজ নির্ধারিত একটা আসনে বসে সারাক্ষণ হুকা টানেন। হুকা টানতে টানতেই লোকজনের কথা শুনেন। আর নাকেমুখে হুকার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই তেলের এবং পানির বোতলে ফুঁ দিয়ে দেন। লোকজন খুশী মনে বাড়ী ফিরে যায়। এখানে সব শ্রেণীর মানুষই আসেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত। নানা শ্রেণীর পেশার মানুষ আসেন। বিশ্বাস আর ভক্তি তাদের এখানে নিয়ে আসে। বড় বড় লোকজন নিজস্ব গাড়ী নিয়ে আসেন। তাঁদের চেহারা আর পোষাক দেখেই ঠাহর করা যায় যে তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের কেউ ক্যান্সারের রোগী নিয়েও আসে। প্রতিদিনই কবিরাজের মজমা থেকে নতুন নতুন গুজব ছড়ানো হয়। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এসব গুজব ছড়ায় আল্লাহ মালুম। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী ভালো হওয়ার গুজব। বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের গুজব।

সড়ক দুর্ঘটনায় পড়া লোকজনের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া হাত পা তেলপড়া মালিশে সম্পুর্ন ভাল হওয়ার গুজব আরও কতো কী! মুখে মুখে এসব গুজব ডালপালা বিস্তার করে। ক্যামনে ক্যামনে যেন সারাদেশের মানুষ জেনে যায়! ভীড় বাড়তেই থাকে মানুষজনের। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে স্বেচ্ছাসেবকেরা হিমশিম খেতে থাকে।

দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকার একসময় সেনাবাহিনীকে মাঠে নামায়। অপারেশন ক্লিনহার্টের আওতায় সেনাবাহিনী দেশব্যাপী অভিযান শুরু করে। দুস্কৃতকারীরা গা ঢাকা দেয়। সেনা সদস্যরাও চান্দু কবিরাজের আস্তানায় নজর রাখতে শুরু করে। একমাত্র অস্বাভাবিক ভীড় ছাড়া চান্দু কবিরাজের এখানে আজ পর্যন্ত আর কোনো অনিয়ম হয়রানীর ঘটনার খবর পাওয়া যায় নি। এখন সেনাবাহিনীর ভয়ে সবাই তটস্থ থাকে। চান্দু কবিরাজের এখানে কোনোরকমের দুই নম্বরী কাজকারবারের ঘটনাও ঘটে না।

একই এলাকার শুভপুরের লেখাপড়া জানা যুবক আব্দুল্লাহ, এসবে বিশ্বাস নেই আব্দুল্লাহর। শুভপুর থেকে চমকপুর এক ঘন্টার রাস্তা। গত ছয়মাস ধরে চমকপুরের চান্দু কবিরাজকে ঘিরে এমন রমরমা কাজকারবার চলে আসলেও আবদুল্লাহ একদিনও সেখানে যাওয়ার আগ্রহ খুঁজে পায় নি। সপ্তাহে দু'একবার নিজের প্রয়োজনে চমকপুর হয়ে

উপজেলা সদরে যেতে হয় আব্দুল্লাহকে। তারপরেও চমকপুরে নেমে চান্দু কবিরাজকে দেখারও ইচ্ছা জাগেনি আব্দুল্লাহর মনে।

আব্দুল্লাহর এক ফুফু ঢাকায় থাকেন। বছরে একবার আমকাঁঠালের মৌসুমে নিজ গ্রাম চমকপুরে আসেন। প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ীতে আম কাঁঠালের অনেক গাছ। আব্দুল্লাহর ফুফাত ভাইয়েরা ঢাকায় সবাই প্রতিষ্টিত। তারা বাড়ীতে খুব কমই আসেন। সময় পান না। আব্দুল্লাহর ফুফু মাসখানেক থেকে গাছের আম কাঁঠাল নিজ হাতে আত্মীয় স্বজনদের বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পান। ঢাকায় ফেরার পথে গাড়ী ভর্তি করে নিয়ে যান নাতী-নাতনীদের জন্য। আব্দুল্লাহ তার ফুফুর বাড়ী আসার খবর পেয়ে চমকপুরে যায় ফুফুকে দেখতে। বাপের বড় বোন। ফুফুও খুব আদর করেন আব্দুল্লাহকে। আব্দুল্লাহকে আসতে দেখে ফুফুও ভীষণ খুশী। কিছুতেই তাড়াতাড়ি যেতে দিবেন না। বাধ্য হয়ে দু-একদিন ফুফুর সাথে থাকতেই হবে।

পরদিন বিকালবেলা আবদুল্লাহর ফুফু আব্দুল্লাহকে চান্দু কবিরাজের কাছ থেকে তাকে তেল-পড়া এনে দিতে বললেন। আব্দুল্লাহর একেবারেই অপছন্দ এসব কবিরাজী-টবিরাজী। তবে ফুফুকে খুব ভয় করে সে। ফুফুর কথা শুনতেই হবে। নাইলে ফুফু রাগ করবেন। বাবার একমাত্র বড় বোন বলে কথা... খুশীমনেই রাজী হওয়ার ভাব দেখায়

আবদুল্লাহ! ফুফুকে একটা খালি তেলের বোতল দিতে বলে। ফুফু বোতল খুঁজে না পেয়ে ছোট এক বোতল তেল কেনার টাকা দিয়ে দেন আবদুল্লাহর হাতে। সাথে আবদুল্লাহকে পকেট খরচের জন্য আলাদা কিছু টাকাও দেন।

আবদুল্লাহ চান্দু কবিরাজের ওখানে যেতে যেতে এক নতুন পরিকল্পনা করে। সে কিছুতেই চান্দু কবিরাজের সাথে দেখা করবে না। তবে যে টাকাটা ফুফু পকেট খরচের জন্য দিয়েছেন সেটা দিয়ে চা-নাস্তা, ফুচকা, আইসক্রিম খাবে। আর ছোট একটা তেলের বোতল কিনে নিয়ে ফুফুকে দিয়ে দিবে। ব্যাস! সারা বিকাল মনের আনন্দে চান্দু কবিরাজের ওখানে ঘুরেফিরে, সন্ধ্যার সময় ফুফুর বাড়ীতে ছোট্ট একটা তেলের বোতল হাতে ফিরে আসে সে। ফুফু তখন মাগরিবের নামাজ আদায়ের প্রস্তুতি নিয়ে জায়নামাজে বসে আছেন। আব্দুল্লাহকে দেখে খুব খুশী হয়ে দোয়া করতে লাগলেন। আব্দুল্লাহর খুব হাসি পেল। তবে নিজেকে সামলে রাখলো সে! পরদিন সকালে খাওয়াদাওয়ার পর আবদুল্লাহ ফুফুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে আসল। আসার আগে ফুফু জানালেন তিনিও আগামী সপ্তাহে ঢাকায় চলে যাবেন। সম্ভব হলে আবদুল্লাহ যেন একবার ঢাকায় বেড়াতে যায়।

দেড়মাস পর ঢাকা থেকে আবদুল্লাহকে লেখা ফুফুর চিঠি আসে। ঢাকায় যাওয়ার তাগিদ। আর যাওয়ার সময় চান্দু

কবিরাজের কাছ থেকে আরও বড় দুই বোতল তেলপড়া নিয়ে যেতে বলেছেন। আর জানিয়েছেন আব্দুল্লাহর এনে দেওয়া চান্দু কবিরাজের তেলপড়া ব্যবহার করে তাঁর পাশের বাসার পরিচিত এক প্যারালাইসিসের রোগী দ্রুত সেরে উঠছেন!

আব্দুল্লাহর মনে পড়ে পাশের বাড়ীর কফিলুদ্দিনও একদিন এভাবেই স্ত্রীর মন রাখার জন্য বাজার থেকে এক শিশি খাঁটি তেল কিনে এনে জুলেখাকে ঘুমানোর আগে তলপেটে মালিশ করতে বলেছিল। জুলেখা ভক্তি বিশ্বাসের সাথে স্বামীর বলা নিয়ম মেনে তেলপড়া ব্যবহার করতে থাকে। দুইমাস পর জোলেখার গর্ভে সন্তান আসে... জোলেখা এখন পাঁচ মাসের সন্তানসম্ভবা! ■

জীবন-স্বপ্ন

সামিমা খাতুন

বাস্তব কঠিন, সত্যি বটে,
তাই বলে থাকবে কি শুধু কল্পনায়?
জটিল সব তত্ত্ব-কথা,
থাক না খোদাই, সরল কিছু আলপনায়।

চিরাচরিত গতানুগতিকতার মাঝেও
থাকে সূক্ষ্ম নতুনের ছোঁয়া,
একঘেয়েমির ইঁদুর-দৌড়ের ফাঁকে
সহজ নয় সবুজটাকে পাওয়া।

জীবন-নদীর অদ্ভুত গতিপথ,
কোথাও পাহাড়, কোথাও মালভূমি,
কখনও সে ঝর্না হয়ে নাচে,
বন্যা হয়ে কখনও ভাসায় সমভূমি।

হঠাৎ যদি আসে এমন দিন,
সুদূর আকাশ দেয় হাতছানি,
পূরণ হবার আসে যদি ক্ষণ,
যত্নে লুকিয়ে রাখা স্বপ্নখানি।

ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত ঠাঁই,
ভুলে তার লক্ষ্য মোহনা,
প্রচলিত নিয়ম ভেঙে নদী,
উড়তে চায়, মেলে ডানা। ■

যাত্রাপথ

রিয়া মিত্র

ভোরের নরম রোদের আলোয়,
এই পৃথিবীর সোহাগ-মাখা নরম ঘাসে,
এক পা এক পা করে আবার নিজের মতো চলতে শেখা।
রোজ প্রতিদিন ঘুমের অবশ পরশ দিয়ে,
মৃত্যু শেখায় এমন করেই নতুন বাঁচা।
সব কিছু আজ মায়া মোহ মিথ্যা,
কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য বোধহয় কিছুই না।
আমৃত্যু প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছি ধাপে ধাপে,
সেও তো মৃত্যু মুখাপেক্ষী যাত্রী হয়ে,
এরপর সমুদ্রের নোনাজলে তাল হারিয়ে যাবে,
পড়ে থাকব ঝোড়োকাকের মতো,
মায়া সভ্যতার মতো আজন্ম
অনন্ত কাল ধরে ক্রমশ হাঁটতে থাকব,
বিলুপ্তির পথে..., হাঁটতেই থাকব...। ■

সৈকতের সততা

শামসুদ্দীন শিশির (বাংলাদেশ)

গ্রামের সব শিশুদের সাথে সৈকতও ভোরে ঘুম থেকে উঠে ধর্মীয় পাঠ গ্রহণের জন্য পাড়ার মক্তবে যেত। মক্তবের মুন্সী ছিলেন আইয়ুব আলী। সবাই তাঁকে মুন্সী ভাই বলেই সম্বোধন করতেন। সৈকত নিয়মিত সঠিক সময়ে মক্তবে যেত। তাই মুন্সী ভাই সৈকতকে খুব স্নেহ করতেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মুন্সী ভাই শিশুদের নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষাও দিতেন। সৈকতের মা-বাবাও সব সময় সৈকতকে সত্য কথা বলা ও সৎ পথে চলার উপদেশ দিতেন। সৈকত মা-বাবা ও মুন্সী ভাইয়ের কথা মন দিয়ে শুনত এবং তা পালন করার চেষ্টা করত। গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার দীক্ষা, ভোরে ঘুম থেকে উঠে মক্তবে যাওয়া এবং বিকেলে খেলাধূলা শেষে মাগরিবের আজানের সাথে সাথে ঘরে ফেরার শিক্ষা, বিশেষ করে অন্যের সম্পদ নষ্ট না করা, মিথ্যা কথা না বলা, অন্যের কোন সম্পদ পেলে মালিক খুঁজে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি মায়ের কাছ থেকে শেখা।

একদিন মক্তবে পড়া শেষে একাই বাড়ি ফিরছে সৈকত। পথের পাশে কয়েকটি নারিকেল পড়ে থাকতে দেখে সে নারিকেলগুলো কুড়িয়ে নেয়। তারপর পথের পাশে কাজ করছে

এমন একজনের কাছে জেনে নেয়, এই নারিকেল গাছগুলো কাদের। সৈকত জানলো গাছগুলো পাশের বাড়ির আকবর চাচাদের। সৈকত নারিকেলগুলো নিয়ে চাচীকে দিল, চাচীও খুব খুশি হলেন। সৈকতকে আদর করলেন। ঘরে বসিয়ে হাতের তৈরি পিঠা খেতে দিলেন। দু'হাত তুলে সৈকতকে দোয়া করলেন। সৈকত আনন্দিত হয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরল।

বিকেল বেলা চাচী দুটো নারিকেল নিয়ে সৈকতদের বাড়ি এলেন। সৈকতের মাকে বললেন, "ভাবী নারিকেলগুলো রাখেন।" সৈকতের মা বললেন, "কেন ভাবী? আমাদের বেশ কয়েকটি নারিকেলের গাছ আছে, আমার নারিকেল লাগবে না।" তখন চাচী সৈকতকে দেখিয়ে বললেন, "সকালে সৈকত মক্তব থেকে ফিরতে পথের পাশে ছয়টি নারিকেল পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে নিয়ে আমাদের ঘরে দিয়ে এসেছে। আমি খুব খুশি হয়েছি। তাই দুটো নারিকেল আপনার জন্য নিয়ে আসলাম। আপনি না করবেন না। এটা আমার ভালো লাগা। সৈকত না হয়ে অন্য কেউ পেলে আমি একটা নারিকেলও পেতাম না।" সৈকতের মা কথাগুলো শুনে খুবই খুশি হলেন। হাসি মুখে নারিকেল দুটো রাখলেন। চাচীকে বসিয়ে পান দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সৈকতের মা সৈকতের জন্য দোয়া চাইলেন। ■

গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন গুঞ্জন

প্রিয়তমাসু

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

যদিও তোমার সাথে আজও দেখা হয়নি
তবুও তোমার চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যাবার ইচ্ছাটা
দিন দিন প্রবল হচ্ছে...
অথচ জীবনের জটিলতা কেমন যেন
দিন দিন তোমাকে
আরও দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...

কবিতায় আমরা এক,
গানের সুরে আমরা অভিন্ন...
মাছ, ভাত আর বেগুন পোড়া,
দু'জনেরই পাতায় ভরা...

তাহলে আমরা ভিন্ন হলাম কেন?
এক শীর্ণ ইছামতী-রেখা
আমাদের চিরতরে করে দিল বিচ্ছিন্ন...
আর আমরা কপাট বন্ধ করে
বাধ্য বাছুরের মতো
স্বাধীনতার ললিপাপ চোষা লালা ঝরাতে ঝরাতে
বসে রইলাম যে যার ঘরে...

ক্ষোভ

আমি জানিনা –
তুমি জানকী কি জাহানারা,
আর আমি তোমার রাম না রক্ষন...
শুধু জানি আমরা দুজনেই
আজ দিশাহারা...

অচেতন অভিমানের মূর্খ বিলাসে
আজও বিপন্ন আমাদের সংস্কৃতি...
শতাধিক বর্ষ তার কাল (কালো!) স্রোতে
ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এক শীর্ণ ইছামতী...

চেয়ে দেখ প্রিয়তমা
এসেছে সময়...
এখন ইছামতী শুধুই পলিময়,
কার ক্ষোভ, কার দোষ,
কার লোভ, কার রোষ,
থাক সে সব নুড়ি পাথরের রেষারেষি...
এসনা, আর একবার স্থির হয়ে
চোখে চোখ রেখে, বসি পাশাপাশি। ■

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

দু'পা এগোলেই সেই নাম না জানা নদীর সাথে দেখা হবে। দুই পাশে রেলিংএর পাশে সবুজ ইউনিফর্ম পরা বন্ধুগুলো... পিকুর উৎসাহের তরঙ্গ দেখে তারাও উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। ব্যস, আর একপা লাফ দিয়ে, পিকু গিয়ে পড়ল ডুব সাগরে। পিকুর সেই ছোট্টনদী, আনন্দের কালো কাজল ঢেলে দিল তার সাদা ধবধবে ইউনিফর্মে। ঠিক যেমন সাদা মেঘে জমে ওঠে কালো আঁধারের ঘনঘটা।

গত চারদিন ধরে বৃন্দাবনে মেঘভাঙা অঝোর বৃষ্টি হয়েছে। যমুনার জল হঠাৎ করে যেন নিজের পুরাণো প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সেই পুরণো গতি ফিরে পেয়ে, সে মনের খুশিতে দু'কুল ছাপিয়ে বয়ে চলেছে তিরতির করে। নীচু জমিগুলো প্রায় এক কোমর জলে টলমল করছে। খেতগুলো থেকে কচি প্রাণগুলো কোনক্রমে একটু উঁকি দিয়ে আলোর সন্ধান করে চলেছে সারাক্ষণ।

মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর সব কিছুর উপর যেন যমুনারই একাধিপত্য! আর হবে নাই বা কেন? সমাজ তার নিজ প্রয়োজন মেটাতে তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। অভিমানী যমুনাও বিনাবাক্যে নিজেকে করেছে দূর-বর্তিনী।

ধারাবাহিক উপন্যাস

জনজীবনকে সু-উন্নত করার তাগিদে মানুষ ধীরে ধীরে তাকে আরও নির্বাসন দিচ্ছে। যে যমুনার স্বচ্ছ জল তরঙ্গে আকাশ পাতাল একে অপরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পারত, তা এখন প্রায় ইতিহাস, কিংবা বলা যায় মানচিত্রে এক ক্ষুদ্র চিত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যতই বুদ্ধিমত্তা দেখাক না কেন, প্রকৃতির কাছে সে সদাই নিরুপায়। তাই বলা যায়, সময় একরকম যায়না। এখন বৃন্দাবনে জলকেলী করার সময় একমাত্র স্রোতস্বিনী যমুনার।

এমতাবস্থায় বড়োরা বিপদে পড়লেও ছোটদের আনন্দে ভাঁটা পড়ে না। বর্ষার অতি বর্ষণ শিশুমনে দেয় প্রকৃতি প্রেমের মিষ্টি স্বাদ। পিকুর ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। পিকুর স্কুলটি মথুরার কাছে। গত কয়েকদিন প্রবল বর্ষণের জন্য স্কুল বন্ধ ছিল। তার মনটা আর বাড়িতে থাকতে পারছিলো না। বড়ই আঁকুপাঁকু করছিল সারাক্ষণ, মুক্ত পরিবেশে ডানা মেলার জন্য। তবে আজ চারদিন পর সে স্কুল যেতে পেরেছে।

পিকু মথুরায় একটি সেন্টাল স্কুলে পড়ে। তাই পিকু স্কুল থেকে ফেরার পথে, জলমগ্ন পথঘাটগুলোকে কল্পনার রঙে জারিত করে বড় নদী বানিয়ে তুলেছে। আর রাস্তার ধারে বর্ষার জলে উজ্জীবিত সবুজ গাছগুলোকে করেছে তার এই খেলার সঙ্গী। আর মেঘের সাথে একাকার হতে কাদাজলে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে কালো মেঘবর্ণ করে তুলেছে। শৈশবটা

অনেকটা বর্ষার মতো, বড়ই চঞ্চল হয়। বর্ষার বারিধারার মতোই শিশুমন কল্পনা ও আনন্দের জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পছন্দ করে। জীবন জটিলতা তাদের আঘাত করতে পারে না।

পিকুকে স্কুল বাসে করে যাতয়াত করতে হয়। গ্রামের অনেকটা ভিতরে তাদের বাড়ি হওয়ায়, বাস থেকে নেমে কিছুটা পথ তাকে হেঁটেই বাড়ি যেতে হয়। শহরের মসৃণ পিচে ঢাকা রাস্তা ছেড়ে পিকু যখন তার গ্রামের অলিগলিতে প্রবেশ করে তখনই তার মজার জোয়ার দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এখানকার পথগুলো বেশ মজাদার, যে সড়ক বা গলি দিয়ে যাত্রা শুরু করা হোক না কেন পৌঁছে যাবে নিজ গন্তব্যে। অর্থাৎ রাস্তাগুলো ঠিক যেন কম্পাস দিয়ে আঁকা গোল বৃত্তের মতো।

পিকুদের পৈত্রিক ভিটে কলকাতায়। পিকুর দাদু কাজের তাগিদে কোন এক সময়ে বৃন্দাবনে এসে ছিলেন। সেই থেকে পিকুর দাদু এখানেই থাকতে শুরু করেন। বর্তমানে পিকুর বাবা পৌরোহিত্য করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছেন। বছরে একবার ওরা সবাই কলকাতায় যায়। এখন পিকুর বাড়িতে পিকুকে নিয়ে পাঁচজন। দাদু, পিকুর মা-বাবা, আর পিকুর ছোট বোন। পিকুর মা একটি হস্ত শিল্প কারিগরির কাজের সাথে যুক্ত আছেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা আগের থেকে অনেক ভালো এখন।

পুরানো পতিত এলাকাগুলোতে এখন সরকারি কিছু অনুদান আসে। তা ছাড়া পিকুর বাবার পৌরোহিত্যের আনুকূল্যে, এখন ওদের দু'তলা পাকা বাড়ি। ওদের এলাকার খান বিশেক বাড়ি ছাড়া, বাকি বাড়িগুলো সব এখন পাকা। পিকুদের বাড়িটা ওই এলাকার শেষ সীমান্তে অবস্থিত। বাড়ির ঠিক পিছনের দিকে দিগন্ত বিস্তৃত খেত... দূর থেকে যমুনার ক্ষীণ সীমারেখা দেখা যায়। তবে গত চারদিনের বৃষ্টিতে সেই সীমা অতিক্রম করে নদী খেতের সাথে আন্তরিক সখ্যতা স্থাপন করেছে।

খুশি মনে পিকু বাড়ির ফিরল। কিন্তু বাড়ির দরজার সামনে এসে হঠাৎ তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কোনো এক অজানা আতঙ্কে সে আঁতকে উঠল। বাড়ির ভিতরে বেশ ভিড়, বেশ চেঁচামেচির শব্দ তার কানে ভেসে আসছিল। ভিড় ঠেলে দেখল তার ছোট্ট বোনটা অঝোর নয়নে কেঁদে চলেছে। দাদাকে দেখে সে ছুটে এসে আদো আদো গলায় বলল, "পিকুদাদা দেখো না সবাই মিলে মা-বাবাকে আর দাদুকে বকাবকি করছে, কেন বকছে ওই কাকুগুলো?" পিকু হতবাক হয়ে বোনের হাতটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল, আর পাশ থেকে পিকুর কানে ভেসে আসল প্রতিবেশীদের বক্তব্য।

...ক্রমশ ■

গল্পে গল্পে বহে বেলা

হাজেরা বেগম

বেশ মনে পড়েছে, কেবলমাত্র গ্রামে বাবা-মা সকলকে ছেড়ে শহরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে এসেছিলাম। বোনের বাসার কয়েক ঘর পরের ঘরটি ছিল জুলিয়াদের। জুলিয়া বেশ চৌকস সুন্দরী ছিল। প্রথম দেখাতেই তার প্রেমে পড়েছিলাম। গাঁয়ের ছেলে লাজুক বটে কিন্তু ওকে যে আমি চেয়েছিলাম। ধীরে ধীরে সবার অলেখ্যে গড়ে ওঠে প্রেম। এক পর্যায়ে দু'জনের সখ্যতা এতোই বেড়েছিল, যে দৈহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল সবার অলখ্যে।

কিন্তু বিধিবাম... ফাইনাল পরীক্ষার আগেই জুলিয়া প্রস্তাব দিল যে তার সাথে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যেতে হবে। ওকে নিয়ে একান্ত আপন হতে হবে তখনই। কিন্তু আমিই তাতে সায় দিতে পারিনি। গরীব বাবার সন্তান পরিবারের সবাই আমার উপর নির্ভর করে। ফাইনাল পরীক্ষা না দিলে জীবনের সব স্বপ্ন যে চুড়মাড় হয়ে যাবে। ওকে অনেক বুঝিয়ে ছিলাম কিন্তু কিছুতেই মানাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত জুলিয়া দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন কোন খোঁজ খবর পাইনি। অনেক চেষ্টা করেও আমার জীবনের সুন্দর

সময়গুলোতে ওকে কাছে পাইনি। শুনেছিলাম এয়ার লাইন্সে কাজ করে, একটা মেয়ে আছে। ঐ মেয়ের জন্য তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।

হাজার চেষ্টা করেও কোনদিন যোগাযোগ করতে পারিনি। আজ হঠাৎ জুলিয়ার কাছ থেকে একটা নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম, ওটাই পড়ছিলাম। সবে শুরু করেছি, "আমি তার তন্বী..." সম্বিৎ ফিরল, আমার বৌ মিথিলার ডাকে। তাড়াতাড়ি কার্ডখানা লুকাতে ব্যস্ত হলাম। বৌ প্রশ্নবোধক চোখে কি হয়েছে গো বলল। কোনমতে সামলে নিয়ে বললাম, "না কিছু নাহ।"

মনে মনে বেশ উত্তেজনা বোধ করছিলাম, কখন দেখতে পাবো আমার ভালোবাসার ফসল তন্বীকে! আরও অস্থির হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল্... ■

PREVENTION OF COVID - 19
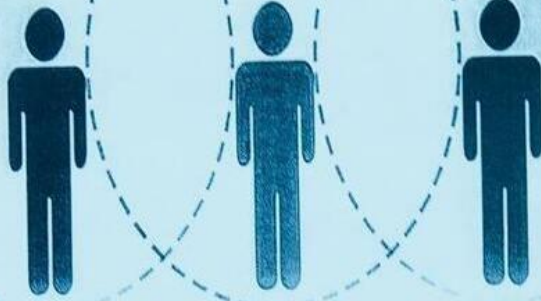
SOCIAL DISTANCING

Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels